







আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টমবর্তিতম গ্রন্থ

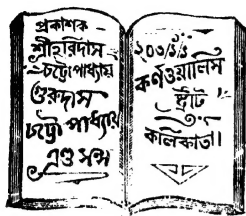
# আয়ুষ্মতী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,  
২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

চৈত্র—১৩৩০

---



প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁড়ার  
 ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ারহাউস  
 ২০৩/১১, কণ্ঠওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করার সময় হ'তে এখনও  
পর্যন্ত যাদের অবাচিত অনুগ্রহ আমি  
পেয়ে আসছি, সেই সকল মহাত্মার  
নামে এই বইখানি সাদরে  
উৎসর্গ করলুম।

খাঁটুয়া পোঃ, গ্রাম.

জেঃ ২৪ পরগণা।

৭।২।২৪

} শ্রীপ্রভাবতী দেবা সরস্বতী



# আয়ুষ্মতী

১

“পবিত্র !—”

আহ্বানটী বড় গম্ভীরে, এত গম্ভীরে যে পবিত্র চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখখানা একেবারে শুকাইয়া উঠিল। উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা তখন তাহার ভাবিবার অবকাশ ছিল না।

এই শাস্ত্র সুন্দর জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনীতে সে একরূপ আহ্বান শুনিবার জন্ত মোটেই প্রস্তুত হয় নাই। নির্জনে চন্দ্রকরোজ্জ্বল ছাদের উপর সুদূর হইতে ভাসিয়া-আসা পাপিয়ার কলতান ও সুদূর হইতে বহিয়া-আসা বসন্ত-পবনের মদিরময় স্পর্শে সে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কল্পনার চোখে সে কত কি দেখিতেছিল, কত মোহজাল আপনার চারিদিকে, প্রাণের ভিতর বুনিতেছিল, এই একটা কঠোর গম্ভীর আহ্বানে তাহার মনের মোহময়



তুলা খসিয়া পড়িল, তাহার সোণার স্বপন টুটিয়া গেল, মোহজাল ছিঁড়িয়া গেল। নিমেষে তাহার চোখের সম্মুখ হইতে শুভ্র জ্যোৎস্না বিদূরিত হইয়া অন্ধকার সারা ধরাখানা যেন প্রাবিত করিয়া ফেলিল।

অত্যা তাহারই। সে তো জানে, তাহাকে এমনি কঠোর গম্ভীর আহ্বান এক দিন শুনিতে হইবে, বুকে কঠিন আঘাত লইতে হইবে। চাঁদের আলো, পাখীর সুর, এ সব শুধু কল্পনাতেই সাজে, বাস্তব জীবনে এ গুলি লইয়া মানুষ জীবন কাটাইতে পারে না। তাহাকে সংসারের নিষ্পেষণে পীড়িত হইতেই হইবে, এবং সেদিন পাখীর সুর তাহার কাণে অতি কটু বলিয়া অনুভূত হইবে, চাঁদ উঠিলেও চারিদিকে অন্ধকার বলিয়া তাহার ধারণা বন্ধমূল থাকিয়া যাইবে।

হাঁ, যথার্থই অত্যা তাহার; তাহার সম্মুখে ভীষণ বিপদ, মাথার উপর কি ভার বোঝা, তবুও সে চাঁদের আলো পাখীর গান উপভোগ করিতে চায়, তাও আবার মনপ্রাণ চালিয়া, একেবারে তাহার মাঝে নিজের অন্তিত্ব বিলীন করিয়া দিয়া। এ কি মূর্থতার কাজ নহে?

“পবিত্র!—”

না, আর এ ভাষে বসিয়া শুইয়া থাকা চলে না, ডাকের

পর ডাক আসিতেছে, তাহাকে সাড়া দিতেই হইবে। সকল জড়তা অপসারিত করিয়া সে উত্তর দিল “যাচ্ছি।”

কিছু চরণ চলিতে চায় না যে, সে যে ভাসিয়া পড়িতে চায়। বিপদ আসিতেছে মনে করিয়াও দিন কাটানো যাইতে পারে, সে আসিবে নিশ্চিত, তাহা জানিয়া ব্যগ্র ভাবে না হয় চাহিয়া থাকিলে হয়। এ যে আসিয়াছে, এখন ইহাকে কোনও ক্রমে এড়াইয়া যাইতে পারিলেই যে বাঁচা যায়।

ভবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একা গৃহে বসিয়া ধূমপানে নিযুক্ত। এটা একেবারেই অভাবনীয়, যেহেতু সারাদিন এবং রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত ঋমিদার মহাশয় বন্ধুহীন থাকিতেন না। পুত্রও তাঁহার সাঙ্গাৎ পাইত না, কেন না দিন-রাতই তিনি “বড় ব্যস্ত” থাকিতেন। আজ তিনি একা অন্তঃপুরে একটা কক্ষে—এ কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? তাঁহার মুখখানি অতিরিক্ত গম্ভীর, সে গম্ভীরতা তাঁহার আলানে কতকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল, এমনি অবস্থায় পবিত্র গৃহপ্রবেশ করিল। তাহার স্বগৌর মুখখানা তখন পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে, চোখ তুলিয়া পিতার পানে তাহার চাহিবার ক্ষমতা ছিল না।

যথার্থই ভবশঙ্কর এমনি রাশভারি লোক ছিলেন। বড় একটা তিনি কথা বলিতেন না, পাছে মর্যাদা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার অগাধ গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যাইত, কবল একস্থানে—বন্ধুদের কাছে।

“এসেছ পবিত্র, এখানে বসো—কথা আছে।”

কি কথা তাহা পবিত্র জানিত। তাহার বুক কাঁপিতেছিল, ফরাসের একপার্শ্বে অতি কুণ্ঠিত ভাবে সে বসিয়া পড়িল।

ভবশঙ্কর অনেক্ষণ নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। সে কলিকার তামাক পুড়িয়া ছাই হুইয়া গেল, ভূত্য আসিয়া আবার ছিলিম বদলাইয়া দিয়া গেল।

তামাক টানিতে টানিতে ভবশঙ্কর বলিলেন “একজামিন হয়ে গ্যাছে তোমার? কেমন দিলে?”

আজ পাঁচ সাত দিন পবিত্র বাড়ী আসিয়াছে, এ কয়দিন এ প্রশ্ন তাহাকে যে করিবেন, পিতার এ সময়টুকুও হইয়া উঠে নাই। পুত্রও প্রাণপণে বরাবর পিতাকে এড়াইয়া চলিত, কাজেই নিজে হইতে এ সংবাদটা পিতাকে দিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করে নাই।

নতমুখে সে উত্তর দিল “একজামিন ভালই দিয়েছি, সবাই বলছে ভাল হয়েছে, পাস হতে পারব।”

“হঁ!” পিতা খানিক নীরব হইয়া রহিলেন, পবিত্রও তেমনি ভাবে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু যে এই কথাটা স্বিক্রান্ত করিবার জন্যই পিতা ডাকেন নাই, আরও যে কথা আছে তাহা সে জানিত, তাই তাহার বুকের মধ্যে বৃহৎ কম্পন চলিতেছিল।

পিতা গড়গড়াটা সরাইয়া রাখিলেন, গম্ভীর মুখে তেমনিই সুরে বলিলেন “একটা কথা তুমি এ পর্য্যন্ত আমার জানাও নি, তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ কথাটা কি।”

পবিত্র নীরব।

ভবশঙ্কর গর্জিয়া বলিলেন “উত্তর দাও—তুমি বিয়ে করেছ এ কথাটা কেন আমার জানাও নি? চুপ ক’রে রইলে যে, বল, উত্তর দাও।”

অপরাধী পুত্রের মুখে একটা কথাও সরিল না।

ক্রুর নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, “আজকাল এমনই লাজেক ছেলে হয়েছে বটে, যে, কোন রকমেই আমার আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাও না। কিন্তু জানো, নিজেকে নিজে যোগ্য মনে করলেই যোগ্য হতে পারা যায় না, তুমি এখনও আমার হাতের মধ্যে আছ?”

“দোষ করেছি বাবা—

পবিত্র পিতার চরণতলে বসিয়া পড়িল, “আমায় মাপ করুন।” তাহার চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাতৃহীন সম্মান সে, চিরটা কাল যদিও সে দূরে দূরে আছে, তথাপি পিতার স্নেহ-দৃষ্টি সর্বদা তাহার উপর। একটীবার মাত্র সে দোষ করিয়াছে। মাপ চায়, এই কথাটা শুনিয়াই পিতার ক্রোধ কর্পূরের ছায় উড়িয়া গেল। তথাপি তিনি কৃত্রিম গাভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন “ই্যা, তুমি দোষ করেছ, আর এ দোষ বড় কম নয় যে, সামান্য মাপ করুন বললেই মিটে যাবে। তুমি জানো, আজ তুমি আমার বংশমর্য্যাদাকে নিতান্ত খেলার জিনিসের চোখে দেখেছ, আর তাকে নিয়ে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারও করেছ। লোকে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে, তবু নিজের মর্য্যাদা কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না। আর তুমি—তুমি কি না এত বড় বংশের একটা মাত্র ছেলে, আমার জীবদ্দশাতেই আমার মুখে, আমার পিতৃপুরুষের মুখে চুণকালী দিয়ে এলে?”

গভীর মর্ম্মবেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। পবিত্র একবার চোখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিয়া তখনি নয়ন নত করিল।

ভবশঙ্কর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বাকু,

এ ক্ষণে তোমার এখন বেশী বলা মিছে, কারণ, ব্যাপারটা এখন অতীতে মিশে গেছে। যাকে বিয়ে করেছ, তাকে কোথায় রেখে এসেছ?”

অন্ধিস্ফুট কর্তে পবিত্র বলিল “সেখানে।”

“সেখানে কোথায়, কলকাতায়?”

পবিত্র বলিল “হ্যাঁ।”

এ কুক্ষিত করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, “এ কাজ তোমার উচিত হয়েছে কি? আজ নয়, কাল সকালেই তোমার যেতে হবে, তাকে আনতে হবে। এই দেখ, তোমার দাদাশস্ত্রের আমায় পত্র দিয়েছেন, তাতেই আমি সব জানতে পেরেছি।”

কম্পিত হস্তে পবিত্র পত্রখানা গ্রহণ করিল।

পিতা গম্ভীর ভাবে বলিলেন “শোন, তোমাদের এখন তরুণ বয়স, এ বয়সে প্রায়ই মানুষের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকে না, এ বয়সে তারা একটা রোখের বশে চলে থাকে। একদিন আমারও এ দিন ছিল, যেদিন রোখের বশে—থাক সে কথা; তোমার বলি, তুমি বিদ্বান, বিজ্ঞার সার্থকতা যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা নিজের মনোবৃত্তিকে মার্জিত করে তুলো, শ্রোতের মুখে তুণের মত ভেসে যেয়ো না। আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলুম, তুমি

আমার সে সকল বার্থ করে অপরিচিতা কোন একটী বাগিকাকে জীবনের সঙ্গিনী করলে জানিনে। এও জানিনে তার এই বিবাহিত জীবনটার আগের ঘটনা কি, কে সে, কোথা হতে এসেছে, বা এর পরে তার কি ঘটেতে পারে। খেয়ালের বশে তাকে সঙ্গিনী করলে, হয় তো এমনও হতে পারে, জানতে পারবে, সে—”

হঠাৎ থামিয়া গিয়া তিনি বলিলেন “না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার জীবনটা যেন সুখময় হয়, হঃখের কণামাত্র যেন তোমাকে বইতে না হয়। প্রথমটা আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, হঃখ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি। যাও, তোমায় আর আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল সকালে তোমার যাওয়া চাইই, আমার পুত্রবধূর পাকস্পর্শ বিশেষ সমারোহের সঙ্গেই হবে।”

ধীরে ধীরে পবিত্র বাহির হইয়া গেল।

গমনশীল পুত্রের সূচাম সুদীর্ঘ দেহের পানে চাহিয়া ভবশব্দর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতি বহুকাল পরে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

সে বড় কম দিনের কথা নয়, তেইশ বৎসর পূর্বে ছয়মাসের শিশু পবিত্রকে রাখিয়া সাধ্বী সতী পতিব্রতা

পত্নী চক্ষু নিম্নীলিত করিয়াছিলেন। পবিত্রের ছোট মাসীমা উমা তখন মাত্র দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, বাল বিধবার আর কেহ না থাকায় দ্বিদির সংসারেই থাকিতেন। এই মেয়েটী পবিত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মানুব করিতে লাগিলেন।

নামে মাসীমা হইলেও পবিত্রের যথার্থ মা তিনিই। গর্ভধারিণী মা তাহাকে অতি শিশু রাখিয়া গিয়াছেন, উমা তাহাকে অগৎ চিনাইয়া দিলেন।

বাস্তবিক উমা ছিলেন বলিয়াই পবিত্র বাঁচিল, নচেৎ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সেও চলিয়া যাইত।

আজও উমা এই সংসারের কত্রী, পবিত্রের মাসীমা। উমার সুব্যবহার সংসার যথাক্রমে চলিতেছে, নচেৎ এ সংসার বোধ হয় একটা দিনও থাকিত না, কোথা হইতে কি উড়িয়া যাইত, তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই।

## ২

পবিত্র যতটা প্রলয়কাণ্ডের আশা করিয়াছিল, ততটা হইল না, ইহাতে তাহার মনটা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বিবাহটা যথার্থই সে রোখের বেশে করিয়া কেলিয়াছিল।



পূরবী মেয়েটা দেখিতে সুন্দরী, কিন্তু তাহার পরিচয় সে কিছুই পায় নাই, পরিচয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও বোধ করে নাই। বন্ধুরা এই বিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার জেদ আরও বাড়িল বই কমিল না।

পূরবীর দাদামহাশয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ সংসারে পূরবীর সমূল ছিল এই দাদামহাশয়টি, আর কেহই তাহার ছিল না। মা বাপ কবে যে অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সে কথা তাহার মনেই নাই। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দাদামহাশয়কে দেখিয়া আসিতেছে, আর আপনার লোক কাহাকেও সে জানে না।

বিবাহের রাত্রে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে পবিত্রের পানে চাহিল, তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, পবিত্রের অনিন্দ্য কান্তির মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

বিবাহের পরদিনই পবিত্র চলিয়া গেল, যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, সে পিতাকে সব কথা জানাইয়া পূরবীকে বাড়ী লইয়া যাইবে।

চারদিনেব কথা সে বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চারদিনের স্থানে দশ বার দিন চলিয়া গেল, তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

নাতনীৰ সিন্দূৰশোভিত সীমন্তেৰ পানে চাহিয়া বৃদ্ধ  
জলধৰ আৰ দীৰ্ঘনিঃশ্বাস ৰোধ কৰিতে পাবেন না। অব-  
শেষে তাহাকে সম্পূৰ্ণ গোপন কৰিয়া, তিনি সব কথা  
খুলিয়া কমা চাহিয়া বেহাইকে একখানা দীৰ্ঘ পত্ৰ লিখিয়া  
ফেলিলেন। সেই পত্ৰই ভবশঙ্কৰেৰ হস্তগত হইয়াছিল।

পত্ৰখানা পাঠাইয়া দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না,  
কে জানে ঠিকানা ভুল হইল না তো।

“দিদি, ঠিকানাটা একবার দেখি, যেখানা পবিত্ৰ  
দিয়ে গেছে তোকে।”

পূৰবী তখন উনানে আগুন দিতেছিল, বাহিৰে আসিয়া  
জিজ্ঞাসা কৰিল “কি দাদা?”

জলধৰ জিজ্ঞাসা কৰিলেন “পবিত্ৰেৰ ঠিকানাটা তোৰ  
কাছে আছে না?”

পূৰবীৰ মুখখানা আৰক্ত হইয়া উঠিল, সে নিজের বাস্তব  
হইতে পবিত্ৰেৰ লেখা ঠিকানায় কাগজখানা আনিয়া  
দাদামহাশয়ের হাতে দিয়া সৰিয়া পড়িল।

পবিত্ৰেৰ সহিত তাহার পবিত্ৰ বিবাহ-বন্ধন, সে তো  
না হয় আজ কয়দিনেৰ মাত্ৰ, কিন্তু ইহাৰ বহুপূৰ্ব হইতেই  
পবিত্ৰ তাহাদেৰ পৰিচিত। এই বৃদ্ধ দাদামহাশয় ও  
নাতনীটিকে পবিত্ৰ বরাবৰই অত্যন্ত দয়াল চোখে দেখিত,

এবং অনেককাল হইতে ইহাদের সাহায্যও করিয়া আসিতেছে। এই অসীম দয়ার বশবর্তী হইয়াই সে পঞ্চদশ বর্ষীয়া পূর্ববীকে বিবাহ করিয়া বুদ্ধকে দারুণ দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

পূর্ববী উনানে আগুন দিতে দিতে পবিত্রের কথাই ভাবিতেছিল, আর তাহার দুইটা বড় বড় চোখ ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

নিষ্ঠুর—

কথাটা আপনা আপনি বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল। সে নিষ্ঠুর বলিতেছে কাহাকে,—পবিত্রকে? পবিত্র এ পর্য্যন্ত যে ব্যবহার তাহাদের সহিত করিয়াছে, তাহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, না, অসীম দয়ার নিদর্শন? হিঃ, সে কাহাকে নিষ্ঠুর বলিতেছে,—যে দয়াবান, কৃপাবান তাহাকে?

স্বামীর সহজের কথা ভাবিতে গিয়া কখন তাহার চোখের জল মিলাইয়া গেল, তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তিনি যে আমার দাদামশাইকে ভীষণ দায় হতে উদ্ধার করেছেন, আমার কুমারী নাম থাণ্ডন করে সধবা নারী শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন ভগবান, তাঁর মঙ্গল

কর। তিনি আমার গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি যেন সারা জীবন কালের মধ্যে একটাবারের জ্ঞাও তাঁর গুণগান করতে বিরত না হই।” •.

সন্ধ্যার পরে জ্যোৎস্নালোকিত ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে সে এই কথাই ভাবিতেছিল। কোন স্মদুরে সেই পল্লীগ্রামখানি, তাহার চিরকাজ্জিকত স্বামী ভবন। আজ এমনি সময়ে এমনি শুভ্র চাঁদের আলোয় সে ভবনটি সিন্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মুক্ত বাতাস মুক্ত ভাবে বহিয়া যাইতেছে। গ্রামের উন্মুক্ত আকাশের তলে গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকাইয়া পানী অবাধ গান গাহিতেছে। আর এই স্মদুর কলিকাতায়—

“দিদি—দিদিমণি, পূরবী—”

“কি দাদা—”

দাদামহাশয় নিচে হইতে ডাকিলেন “এ দিকে আর একবার, দেখে যা কে এসেছে।”

কে আসিয়াছে, স্বামী আসিয়াছেন কি? পূরবীর বুকটা পুলকাবেগে কাঁপিয়া উঠিল।

তখনই সে সে আবেগকে দমন করিয়া ফেলিল—না, তিনি কেন, তিনি নহেন। আর কেহ হয় তো আসিয়াছে, দাদু তাই ডাকিতেছেন।

নিচে নামিতেই সে দাদামহাশয়ের গৃহে আর একটা লোকের কণ্ঠস্বর শুনিত পাইল। এ স্বর তাহার চির-পরিচিত, বুকের মধ্যস্থত্রে স্তরে এই সুরই জমিয়া আছে।

পবিত্র ফিরিয়াছে। সে দয়াবান, সে প্রতারণা করে নাই, একটা নারী-হৃদয় একেবারে ব্যর্থ করিয়া যায় নাই, সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল।

পবিত্র জিজ্ঞাসা করিল, “চারদিনের যায়গায় এতদিন হয়ে গেল, তুমি কি ভাবছিলে পূর্ববী?”

পূর্ববী মাথা নাড়িয়া বলিল “কিছুই না।”

“কিছুই না বই কি?” পবিত্র তাহার মুখখানা নাড়িয়া দিয়া বলিল “এটা তোমার একেবারে মিথ্যে কথা পূর্ববী; নিশ্চয়ই ভাবছিলে জুয়াচোর, ঠক, কেমন?”

পূর্ববী তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, “অমন কথা বলো না, মুখেও এন না। আমার ভাবনা কি বল। আমি কোথাকার কে, দরিদ্রা, নগণ্যা একটা নারী মাত্র, তুমি দয়া করে আমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ—”

“চুপ, চুপ, বড় বেশী বলে যাচ্ছ, পূর্ববী, তোমার চেয়ে তোমার কথাটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, সেটা মনে করে কথা বল।”

পুরবী ক্লককণ্ঠে বলিল “পথের ধূলোকে আদর করে মাথায় যদি স্থান দাও, সে যে সেই ঘৃণ্য ধূলো মাত্র তা সে কিছুতেই ভুলবে না। আর সত্যিও সে কথা যে সে ধূলোই থাকবে, সোণার মত ছাতি ধরবার কিছা সোণার সমান মূল্যে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার কিছুতেই নেই। তুমি আমায় আদর করে গ্রহণ করলেই কি আমি ভুলে যাব—আমি কি? পথের ভিখারিণী হতে রাজরাণী হয়ে কি ভুলে যাব—আমি কি ছিলাম?”

বাগ্রকণ্ঠে পবিত্র বলিল, “যাক যাক, ও সব কথা ছেড়ে দাও। ধূলো আর স্বর্ণরেণুর তুলনা করবার জ্ঞে আমি বিশেষ বাস্তব নই, তা বোধ হয় জানছো। আর যদি সে তুলনা দিতে তুমি চাও, তবে আমায় অতটা উঁচু না করে নিচের পদবীতে ফেল। ধূলো রাজার মাথায় স্থান পায় না, কিন্তু রাজার শক্তি যে প্রজা, সেই প্রজা কৃষকের কাছে ধূলো কি রকম আদরের জিনিস তা বোধ হয় জান। কৃষক ধান তোলে, আবার প্রার্থনাও করে রাখে, আসছে বছর যেন এই ধূলো মাথায় গায়ে মেখে সে জীবন ধারণের সার্থকতা লাভ করতে পারে।

পুরবী শুধু জলভরা বড় বড় ছইটী চোখ মেলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল,—এত বড় মহান্ কথার

উপর তাহার তুচ্ছ কথা পাড়িবার সাহস আর তাহার হইল না।

পবিত্র বলিল “এখন আমার বাড়ীর কথা শুনবে পূরবী, না, ওই সব তুচ্ছ কথায় আপনাকে একেবারে মগ্ন করে রাখবে, বল ?”

দীর্ঘ কণ্ঠে পূরবী বলিল, “বাবা শুনছেন ?”

পবিত্র বলিল, “দাদামশায়ের পত্রখানা তাঁকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছে। এক রকম হল ভাল, কেন না, এ কথা যে কি করে আমি তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। আমার সামনে যে কি বিপদ জাগছিল, তা বোধ হয় অনুভবে কতকটা বুঝতে পারবে পূরবী। বাবার বংশমর্যাদার জন্তেই আমার বড় ভয় ছিল, ভেবেছিলুম, তাঁর সেই বংশমর্যাদা আমার দ্বারা নষ্ট হল, তিনি কখনও এ সহ্য করবেন না; কিন্তু বেশী আশ্চর্যের কথা—তিনি সহজেই এটা মেনে নিলেন।”

বিস্ময়ে পূরবী বলিল “মেনে নিলেন ?”

উৎসাহিত কণ্ঠে পবিত্র বলিল “নিলেন বই কি ? প্রথমটার আমার খানিকটে বকলেন, তার পর হকুম দিলেন, আমায় আজ এখানে এসে তোমার নিয়ে যেতে হবে। তোমার যে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, অত বড় একটা

সম্মাননীয় বংশের একমাত্র বধূ তুমি, এটা বিশেষ সমারোহের মধ্যে দিয়ে সব লোককে জানিয়ে দিতে হবে, এই তাঁর ইচ্ছা।”

আনন্দে পূর্ববীর চোখ দুইটা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তবে তাহার স্বামিভবনে প্রবেশ করিবার অহুমতি পাইয়াছে। তাহার এতদিনকার প্রার্থনা নারায়ণের চরণোপাস্ত্রে পৌছিয়াছে, তাহার প্রার্থনার ফল সে পাইয়াছে।

মনের আবেগে সে, সে রাত্রে কত কথাই বলিয়া ফেলিল ঠিক নাই. এত কথা সে জীবনে কখনও বলে নাই।

“দাদাকে বলেছ?”

পবিত্র মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তাড়াতাড়িতে তোমায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারি নি। সকালে বলব এখন সে কথা।”

পরদিন সকালে পবিত্র জলধরের কাছে বলিল, “বাবা আপনার নাতনীকে নিয়ে যাবার জন্তে আমার পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

বুক তখন একখানা অতি পুরাতন জীর্ণ খাতায় কি পড়িতেছিলেন, ধীর কণ্ঠে বিজ্ঞাসা করিলেন “কাকে, পূর্ববীরকে?”



পবিত্র উত্তর দিল “হ্যাঁ।”

জলধর বলিলেন “তোমার বাবার মত হয়েছে ? রাগ করেন নি, তুমি তাঁর অন্তে বিয়ে করেছ শুনে ?”

সংক্ষেপে পবিত্র উত্তর দিল “না।”

“ভারি খুশি হয়েছি শুনে। নিয়ে যাবে—আচ্ছা, তা নিয়ে যেয়ো, আমার তাতে আর কি আপত্তি থাকবে ভাই ? তোমার জিনিস, তোমার যা ইচ্ছা তাই এখন করতে পার। এতটুকু বেলা হতে মানুষ করেছি, এই পনেরটা বছর আমারই কোলে মানুষ হয়েছে। প্রথমটায়—তা একটু কষ্ট হয় বই কি। না,—ভার আর কষ্টই বা কি—তবে—”

তাঁহার মলিন চোখ দুটি বুঝি ধীরে ধীরে অশ্রুপূরিত হইয়া উঠিতেছিল। মুখখানা আরও নিচু করিয়া তিনি বাঁ করিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “বেশ তো, এর বেশী আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে, কেই বা আশা করতে পারে।” বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। এ হাসি যে কিসে তৈয়ারী, তাহা পবিত্র বুঝিয়াছিল, তাই সে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরবী চলিয়া যাইবে—বৃদ্ধ দাদামহাশয় ভারী ব্যস্ত। তাঁহার জ্ঞাত বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বাক্স, সাবান কাপড়

সেমিঞ্জ প্রভৃতি কিনিতেছিলেন, সিন্দুরের কোটা কাটা চিকনি প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না।

এই সব কিনিতেছিলেন আরামাফিয়া থাকিয়া তাঁহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, পনের বৎসরের মধ্যে একটা দিন যাহাকে কোলছাড়া করেন নাই, সে আজ চলিয়া যাইতেছে ; কে জানে কতদিন বাদে সে ফিরিবে।

বেলা প্রায় বারটার সময়ে ষষ্ঠ্যসিক্ত দেহে হাঁফাইতে হাঁফাইতে জলধর দুজন কুলীর ঘাড়ে সওয়া চাপাইয়া বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন।

বাস্ত পূরবী তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে বেশী গুট কত জিনিস নামাইয়া লইয়া, তাঁহাকে বসাইয়া জিনিসপত্র সব গৃহে তুলিল। জলধর সহাস্ত্রমুখে সবগুলি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

অনর্থক এতগুলি টাকা ব্যয়ের কথা শুনিয়া পূরবী রাগ করিয়া বলিল, “আচ্ছা দাদু, এত টাকা খরচ করে এই জিনিসপত্র কেনবার কি মানে ছিল ?”

দাদুর প্রকৃত মুখখানা নাতনীর এই তিরস্কারে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন “তুই চলে যাবি দিদি, একেবারে খালি হাতে,

সত্যিই একটা হাড়ি বাগদির মেয়ের মত উঠবি সেখানে, তাই এই গোটাকত জিনিস কিনে আনলুম। এমনই তো কপাল যে তোর হাতে শুধু কাঁচের চুড়ি দিয়েই পাঠাতে হচ্ছে, তা আর কি করব? সম্বলের মধ্যে আছে এই ছোট গুটি তিনেক স্বর নিয়ে ছোট বাড়ীখানা, আর পেনসান কুড়িটা টাকা মাসিক আয় মাত্র—”

রক্তিম মুখে পূরবী বলিল “তারই তো এই ষাট সত্তর খানেক টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে এলে দাড়। কুড়ি টাকা মাসিক আয় হতে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যা ছুটি একটা টাকা সঞ্চয় করেছিলে, তা এমনি করেই ঘুচিয়ে দিলে; এর পর তোমার কি উপায় হবে বল তো?”

দাদা মহাশয় নিজের কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুটে যেন আপনা আপনিই বলিলেন, আবার আসছে মাসে কুড়িটা টাকা তো পাব। একটা মানুষ মাত্র, আলু সিদ্ধ ভাত খেয়েই একটা বেলা কেটে যাবে, আর একটা বেলা—বা হয় কিছু খেয়ে—”

ভাঁহার সেই মুখখানার পানে চাহিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পূরবী চলিয়া গেল।

এমনি করিয়াই বৈকাল আসিয়া পড়িল, সন্ধ্যার ট্রেণে তাহারা যাইবে, এখনই বাহির হইতে হইবে।

দাছকে বিদায় প্রণাম করিতে গিয়া পূরবী কাঁদিয়া আকুল হইল। অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দাছ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন “কাঁদছিস কেন দিদি, মেয়েদের বাঞ্ছিত স্বামিগৃহে যাচ্ছিস, এ যে বড় সৌভাগ্যের কথা। প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, যেন স্বামী গৃহেই তোর জীবন কেটে যায়, কোন দিনকার কলঙ্কের বাতাস তোর গায়ে এসে যেন না লাগতে পারে।

পূরবী উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিতে চাপিতে বলিল “তুমি সেখানে যাবে না দাছ?”

পবিত্র পিছন হইতে বাগ্রকণ্ঠে বলিল “আপনি যাবেন দাছ, বউভাতের সময় বাবা আপনাকেও নিমন্ত্রণের চিঠি দেবেন।”

“যাব দাছ—নিমন্ত্রণ পেলেই যাব।”

বিদায় লইয়া তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, বৃদ্ধা শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সে দিন তিনি আর উঠিলেন না, রাত্রে আহারাদিও করিলেন না, তাঁহার প্রিয় ছকা কলিকা অনাস্বাদিত অবহেলিত পড়িয়া রহিল।

নূতন বধু আসিয়াছে, শুধু বাড়ীতে বলিয়া নয়, গ্রামেও একটা গোল উঠিয়াছে। এই বিস্ময়কর বিবাহ, বিস্ময়ের পাত্রী নববধূকে দেখিতে দলে দলে গ্রামের মেয়েরা আসা যাওয়া করিতেছে।

জমীদারের একটা মাত্র পুত্রের একুপ গোপন বিবাহ আশ্চর্যের কথাই বটে।

রামময় মুখোপাধ্যায় তামাক টানিতে টানিতে মাথা হুলাইয়া বলিলেন “হঁ, নিশ্চয়ই এর কোনও কারণ আছে, নইলে এমনটা হয় ? এত গোপনে—গা ঢাকা দিয়ে বিয়ে ; আচ্ছা রোসো, আমি সবই বের করে নিচ্ছি। যদি না পারি আমার নাম রামময় মুখুযোই নয়।

ভগবানের আশ্চর্য্য সৃজন এই পল্লীবাসী বুদ্ধগুণা, ইহাদের উর্কর মস্তিষ্কে যথার্থই অনেক চিন্তা স্থান পায়, এবং ক্রমে বড় বৃক্ষরূপে পরিণত হয়।

রামময়ের একুপ করিবার আরও কারণ ছিল। জমীদারের সহিত কয়েকটা মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া তাঁহার জমীদার-বিষেব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন এক দিন ছিল, যে দিন তিনি সমান চালে জমীদারের

সহিত চলিয়াছেন। শুনা যায়, দশ এগার পুরুষ পূর্বে  
ইহাদের সব একই ছিল, দশ এগার পুরুষ মাঝে ব্যবধান,  
পুরুষাশুক্রমিক বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে।

অদৃষ্টের বশে রামময় শেষ কালটায় ক্রমাগত হারিয়াই  
যাইতেছিলেন। যত হারিতেছিলেন ততই তাঁহার বিদেহ  
বাড়িয়া চলিতেছিল। এখন তিনি ভবশঙ্করের সামান্য  
একটু ক্রটি খুঁজিবার অস্ত্র বাস্তব। যেক্রমেই হোক, সকলের  
চোখে তাঁহাকে অপদস্থ করাই তাঁহার ইচ্ছা।

এই গোপন বিবাহের পক্ষোদ্ধার করিবার জন্য রামময়  
উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন,—ভদ্রলোকের তাহার নিদ্রা  
এককালে দূরীভূত হইয়া গেল বলিলেও চলে।

উমা পবিত্রের পত্নীকে পাইয়া যথার্থই বড় আনন্দিতা  
হইয়াছিলেন। সেই আনন্দের মধ্যে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল  
গড়াইয়া পড়িয়াছিল, স্বর্গগতা ভগিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া  
নীরবে তিনি প্রণাম করিলেন।

পবিত্র ও পূর্ববীকে প্রথমেই তিনি ঠাকুর ঘরে লইয়া  
গিয়া প্রণাম করাইলেন। তাহার পর ভবশঙ্করের শয়ন কক্ষে  
উভয়কে লইয়া গিয়া, দেয়ালে বিলম্বিত মৃত ভগিনীর কটো  
দেখাইয়া, বাষ্পক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “এঁকে প্রণাম কর  
পবিত্র, তুমিও প্রণাম কর মা।”

পবিত্র বিদ্রোহীভাবে বলিল “কেন?”

বিশ্বয়ের সুরে উমা বলিলেন, “কেন আবার কি পাগলা ছেলে? তোর মা যে, প্রণাম করবি নে?”

পবিত্র উমার শাস্ত স্নিগ্ধ মুখখানার পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল “এটা আমায় ভুল বুঝাচ্ছ মা। আমার মা একমাত্র তুমি, এ জগতে আর আমার কেউ মা নেই। ছবিকে আগে প্রণাম করে আমার কি তৃপ্তি হবে মা, আমি আগে তোমারই পায়ের ধুলো মাথায় দিই।”

নত হইয়া সে উমার পায়ের ধুলো তুলিয়া মাথায় দিল।

“আ ছি ছি বাবা, কি করিস, তার কিছু ঠিক নেই” বলিতে বলিতে উমা তাহার মুখখানা বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন, উদ্বেলিত অশ্রু আর মানা মানিল না, সকল মানা অতিক্রম করিয়া তাহা পবিত্রের মাণার উপর ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

“ওরে, আমি যে তোর মাসীমা, এই যে তোর মা, আমার দিদি। আচ্ছা পাগল, না হয় আমার বড় দিদি বলেই প্রণাম কর, তাতে তো কিছু তোর আসবে যাবে না।”

পবিত্র মাথা নাড়িয়া বলিল “না, তা আসবে যাবে

না। প্রণাম করছি, কিন্তু সেটা কেবল তোমার খাতিরে, তোমার বড় বোন বলে, আমার মা বলে নয়।”

সে প্রণাম করিল, পূরবীও প্রণাম করিল।

পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়াছে সংবাদ পাইয়াও ধীর প্রকৃতি ভবশঙ্কর বাস্তব হইয়া উঠিলেন না। মনটা চঞ্চল হইয়া নিশ্চয়ই উঠিয়াছিল, অবাধ্য মনকে তিরস্কার করিয়া ধীরে স্নেহ হাতের কাজ শেষ করিয়া ঠিক নিয়মিত সময়েই অন্তঃপুরে আসার জ্ঞান ভবশঙ্কর গুল্মোৎখান করিলেন।

দেওয়ান বনমালী রায় বলিলেন “খোকাবাবু সেই ভোরবেলা বউমাকে নিয়ে এসেছেন, বেলা একটা বাজে, আপনার একবারও এর মধ্যে বউমাকে দেখার অবকাশ হল না বাবু?”

তাড়া দিয়া উঠিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “নিয়ে এসেছে ভালই, কাজ ফেলে রেখে আমাকেও যে ছেলেমানুষের মত বউ দেখতে ছুটতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বউ তো পালাচ্ছে না, হচ্ছে।”

তাড়া খাইয়া বৃদ্ধ বনমালী রায় আমতা আমতা করিয়া সরিয়া গেলেন। ছোট বেলা হইতে এই বৃদ্ধ এ সংসারে প্রতিপালিত, আজীবন তিনি কুমার, নারী মাত্রই তাঁহার মা। সকলে তাঁহাকে ফেপাইত,—বিধাতা বনমালী রায়ের



অদৃষ্টে বিবাহ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কথাটা যথার্থ ই সত্য, তাই এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বনমালী রায় অবিবাহিত।

পবিত্র ছিল বনমালী রায়ের বড় প্রিয়। অন্তঃপুরে মাসীমা উমার কাছ হইতে সে মাতৃস্নেহ পাইয়াছিল, বাহিরে বনমালী রায়ের নিকট হইতে সে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। পবিত্র যাহাতে দশটা লোকের মধ্যে একটা লোক হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, বনমালী রায়ের দৃষ্টি সেদিকে বড় তীক্ষ্ণ ছিল। সেই পবিত্র বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রী আসিয়াছে, বনমালী রায়ের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না।

আনন্দে অধীর তিনি—সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাকেই এই স্বেসংবাদ দিতেছিলেন, পবিত্র বউ লইয়া আসিয়াছে। বলিতে গেলে তাঁহার দ্বারাই এ সংবাদটা সমস্ত গ্রামে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রামের লোক আসিয়া বউ দেখিয়া গেল, আর পবিত্রের যিনি পিতা, তিনি জমীদারির কাজে এত বিব্রত যে, পুত্রবধূর মুখখানা দেখিবার অবকাশ পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। বনমালী রায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনের মধ্যে অনেক-গুলি কঠিন কথা স্তরে স্তরে জমা হইতেছিল, কিন্তু সব

কথা বলা হইল না, ভবশঙ্করের মুখ দেখিয়াই তাঁহাকে পলাইতে হইল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই ভুবশঙ্কর পূত্রবধূর মুখ দেখিলেন। উমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎসুকনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভবশঙ্কর একটা কথাও বলিলেন না, নিজের মত ব্যক্ত করিলেন না, মুখখানাও যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল, একটুও পরিবর্তিত হইল না। আশ্চর্য্য মানুষ বা হোক।

নিত্যকার মত আহারাদি শেষে একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ভবশঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া বনমালী রায়কে ডাকিয়া বলিলেন, “কতকগুলো জিনিসপত্র কলকাতা হতে কিনে আনতে হবে তোমাকে, আর এখানে আসছে রবিবারে সমাজ থাণ্ডয়ানো হবে, তার বন্দোবস্ত কি করছ?”

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বনমালী বলিলেন “আমি তো কিছুই করছি নে তার জ্ঞে।”

“কিছুই করছ না?” উগ্রস্বরে ভবশঙ্কর বলিলেন “বেশ লোক তুমি। আমার চেয়ে এ দিকে সব বিষয়ে তোমার বুদ্ধি বেশী, এটার বেলায় এ রকম কাঁচা কাজ করছ কেন? দেখছ, পবিত্র বিয়ে করে বউ নিয়ে এল। জানো, যদিও

চুপি চুপি সে বিয়ে করেছে, তবু যে মেয়েটা আমার পুত্রবধূ হয়েছে, তাকে এখন সমাজে পরিচিতা করে দেওয়া তার কাজ নয়, আমার কাজ। পাকস্পর্শ তো করতে হবে, যাতে লোকে জানতে পারবে, পবিত্রের বিয়ে হয়েছে। আর সেটা কিছু বেশী রকম সমারোহের মধ্যে দিয়েই করা আমার ইচ্ছে; তাই আমি ভাবছি, শুধু খাওয়ালেই হবে না, সকলের হাতে একটা করে টাকা দেওয়া বাবে—আর সমাজের প্রত্যেক বাড়ীতে পবিত্রের বিয়ে উপলক্ষে ঘড়া খালা বাটা দিতে হবে, ‘কেমন?’

আনন্দে বনমালী রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে-ছিল না, কিন্তু এ আনন্দ প্রকাশের স্থান নয়, তাহা হইলেই এখনই ছেলেমানুষ বলিয়া তাঁহাকে তাড়া খাইতে হইবে।

“যে আজ্ঞে। রামময় বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত—”

ভবশঙ্কর বলিলেন “নিশ্চয়ই। আসুন বা না আসুন, আমাদের নিমন্ত্রণ করা অবশ্য কর্তব্য কাজ। আমি এইবার সমাজসুত্র লোকের নামের একটা তালিকা করি গিয়ে মুহুরীকে নিয়ে, আর তুমি ও তোমার এ দিককার কাজ নেরে এসো আমার কাছে।”

ইহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেল, রামময় বাবুও বাদ পড়িলেন না।

সেই দিনই বনমালী রায় মহা আনন্দে জিনিস-পত্রাদি কিনিতে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

## ৪

মাঝের কয়টা দিন গোলমালের মধ্য দিয়া বাঁ বাঁ করিয়া কাটিয়া গেল, রবিবার আসিয়া পড়িল।

সমাজের লোক জমীদার-বাড়ী নিমন্ত্রিত। বাড়ীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দাদামহাশয়ও আজ প্রাতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার পুরবীর স্বশুরালয়, রাজা স্বশুর, এ সব দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিতেছিল না। তিনি চারিদিক বেড়াইয়া দেখিতে-ছিলেন, অবসর মত বনমালীবাবু তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিতেছিলেন। উভয় বৃদ্ধে মিলিয়া গিয়াছিল বেশ।

ছপুর বেলায় কর্মশ্রান্ত বনমালী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জলধরের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। জলধর তখন তামাক টানিতে টানিতে প্রসন্ন মনে চারিদিকে চাহিতে-ছিলেন। একদিকে যত ভজের সম্মিলন। পিছনের দরজায় রাজ্যের ভিখারী আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের কোলাহলে পিছন দিকটাও পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশে পাতলা মেঘ ভাসিয়া আসিয়াছে, ফাল্গুনের রৌদ্রতেজ তাই মন্দীভূতা। বাহির বাটীতে বিশাল সামিয়ানার নিচে শত শত লোকের পাতা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বসিলেই হয়।

একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে চাহিয়া প্রফুল্ল মুখে জলধর জিজ্ঞাসা করিলেন “এ সবই রাজাবাবুর প্রজা?”

সগর্বে বনমালী ছঁকায় একটা টান দিয়া বলিলেন “নিশ্চয়ই।”

এই নিশ্চয়ই কথাটার মধ্যে খানিকটা মিথ্যা কথা ছিল বই কি। কারণ, ইহার মধ্যে রামময় বাবুরও প্রজা আছে, একা ভবশঙ্করেরই নাই।

কিন্তু প্রভুর মর্যাদা বাড়াইতে বনমালী অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামের নাম করিয়া চলিলেন, এবং সগর্বে জানাইলেন, এ সবই তাঁহার প্রভুর জমিদারী।

আহার স্থানে পাতা পড়িয়াছিল, কিন্তু কেহই বসিল না—একস্থানে সমবেত হইয়া গোল পাকাইতে লাগিল। গোলমাল দেখিয়া বনমালী উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন “আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসি ব্যাপারখানা কি?”

যেখানে অনেক লোক জমা হইয়াছিল, বনমালী

দেখিলেন, তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে  
রামময় বাবু।

“এ কি, আপনারা সব দাঁড়িয়ে রইলেন বে? পাতা  
হয়েছে, বসবেন চলুন ; রামময় বাবু, আপনিও চলুন।”

গম্ভীর কণ্ঠে রামময় বাবু বলিলেন “আমি খেতে  
আসিনি।”

“খেতে আসেন নি!”

বনমালী একেবারে খতমত খাইয়া গেলেন—“খেতে  
আসেন নি, তবে কি করতে এসেছেন?”

তেমনি স্থরে রামময় বাবু বলিলেন “সমাজের এতগুলি  
লোকের যাতে জ্ঞাতপাত না হয়, যাতে তাঁদের জ্ঞাতধর্ম  
অক্ষত অটুট থাকে, আমি তাই করতে এসেছি।”

“কিসে জ্ঞাত ধর্ম নষ্ট হবে রামময়, আমার বাড়ী  
খেলে?”

পিছন হইতে এই স্থির কথা শুনিয়া বনমালী সচকিতে  
ফিরিয়া দেখিলেন, পিছনে দাঁড়াইয়া ভবশঙ্কর, তাঁহার ছটি  
চক্ষু হইতে অগ্নি ঝরিয়া পড়িতেছে।

রামময় বাবু চোখ তুলিয়া সেই অগ্নিস্পর্শী চোখের  
উপর ঠিক রাখিলেন ; সংযত কণ্ঠে বলিলেন, “ই্যা, আপনার  
বাড়ী খেলে লোকে জ্ঞাত ধর্ম হারাবে।”

ভবশঙ্কর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতে-  
ছিলেন, হঠাৎ সে কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “কিন্তু  
সমাজের এই সব লোকেরাই তো এই কয়েক মাস আগে  
পুজোর তিন দিন আমার বাড়ীতে থেয়েছে, তখন ওদের  
জাত ধর্ম্ম যায় নি ?”

শ্রির ভাবে রামময় বাবু বলিলেন, “না তখন যায় নি,  
যাবার কথাও ছিল না। এখন যাবার কারণ হয়েছে,  
তাই কেউ থাকে না।”

“কি কারণ হয়েছে রামময় ?”

রামময় বলিলেন, “কারণ আপনার ছেলে এক বেশ্যার  
মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে, তাই সমাজ জানতে পেরে  
আপনার বাড়ীর আহারাদি বর্জন করতে চায়।”

“বেশ্যার মেয়ে ? রামময়, মুখ সামাল করো। ভদ্র  
লোকের মেয়ের নামে এ রকম অপবাদ, এ কখনই সহ্য  
হয় না।”

ভবশঙ্কর জুড় সিংহের ছায় গর্জিয়া উঠিলেন, উপস্থিত  
আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু রামময় বাবু  
দমিলেন না। ধীরকণ্ঠে বলিলেন, “বিনা প্রমাণে আমি  
একজন ভদ্রকন্ঠার উপরে এই দোষারোপ করছিনে;  
আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ-বিসম্বাদ থাকতে পারে,

আপনার নির্দোষ পূত্রবধূর সঙ্গে নেই, কিম্বা তা নিয়ে আপনাকে নির্যাতিত করতেও আসি নি। সত্য যা তাকে অনায়াসে সকল সময়েই সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারা যায়। যথার্থ সাধু'রী সত্যকে অজ্ঞানের অনুরোধে কখনই চেপে রাখেন না, আর তা রাখতে গেলেও থাকে না। কারণ সত্যের জয় সর্বদা, সর্বদা। তার উপর ভাজার মিথ্যাব বোঝা চাপাও না কেন, ভয়ানকাদিত আশ্রয়নর মত সে প্রকাশ হয়ে উঠবেই।”

কথা শুনা শেষ করিয়া এই বথার্থ সাধু লোকটী একবার বিশাল গুহে তা দেখা লইলেন। তাঁহার উবার মুখখানা দেখিয়া সত্যই ভবশঙ্কর দমিয়া গেলেন, তাঁহার মুখখানা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

তঁাকু দৃষ্টিতে সামান্যদা! একবার তাঁহার মুখখানা দেখিয়া গইলেন, বলিলেন “গ্রামি আজ তিন দিন হল এই কথাটা শুনেছি, ভেবেছিলুম আপনিও জানেন——”

দমিয়া পড়িয়া ও সর্পের মত গর্জিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “আমি জানি, স্নেহে শুনে আমি——”

হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন, কর্তব্যর মুহূর্তে নরম



করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “আজ তিন দিন তুমি জেনেছ, তবু এ খবরটা আমার জানাও নি কেন রামময় ?”

রামময়বাবু অপ্রস্তুতের মত মুখখানা করিয়া বলিলেন “সেইটুকুই আমার অজ্ঞায় হয়ে গেছে, তা আমি স্বীকার করাছি। কিন্তু কি করে আমি জানাব বলুন ? আর আমাকেও তার পরেই সহরে যেতে হয়েছিল, আজ সকালে মাত্র ফিরে এসে শুনলুম সমাজ স্তম্ভ নিমন্ত্রণ, আমাকেও দয়া করে বাদ দেন নি। ভাবলুম—যাক নিমন্ত্রণ স্থলে গিয়েই সব বলা যাবে। তা বলে এত বড় একটা অনাচার যে সমাজের মধ্যে অনায়াসে চলে যাবে, তা কোন মতেই হতে পারে না। হিন্দুর জাত—এ কি বড় মুখের কথা ? হিন্দুর আর আছে কি ? একে একে সে সবই বিসর্জন দিয়েছে, জাতটাকে শুধু আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। এ জাত যদি যায় তবে হিন্দুর সব গেল। আর হিন্দু বলে পরিচয় দেবার মুখ তার আর রইল না। জাত—কি জানেন মশাই, বড় ঠুনকো জিনিস, যেন কাঁচের বাসন। লোহার মত শক্ত হলে ভাঙ্গবার ভয় থাকত না, যা খুসি অনাচার এর মধ্যে চালালেও চলতে পারত, কি বলুন ?”

তিনি যতক্ষণ জাতির মর্যাদা প্রকাশ করিতেছিলেন,

ভবশঙ্কর ততক্ষণ রাগে জলিয়া যাইতেছিলেন। রাম-  
ময়ের সংসারের কথা তাঁহার কাছে গোপন ছিল না।  
নির্কিষ খোলস পৈতাখানা গুল্মায় বুলাইয়া রাখিয়া,  
সমাজের চোখে বংশমর্যাদা জ্ঞাতি গর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যত  
কিছু ব্যভিচার সবই তিনি অনায়াসে করিয়া যাইতেন,  
কিছুই বাধিত না। আত্ম সে সব কথা ভবশঙ্কর বলিতে  
পারিতেন, কিন্তু বলিবার মত সময় এ তো নয়। তাঁহার  
নিজের গৃহের কলঙ্ক যে এ, তিনি যে একটি কথা  
বলারও অধিকার আজ হারাইয়াছেন।

সকলের মুখের পানে তিনি একবার চাহিলেন।  
নিমন্ত্রিতদের উদরে প্রবল ক্ষুধা, তাহারা আহারার্থ  
আসিয়াছে, ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে তাহারা পাতার পানে  
চাহিতেছে, তবু উদরের প্রবল ক্ষুধা, বক্ষের প্রবল তৃষ্ণা  
চাপিয়াও তাহারা মাথা হুলাইয়া বলিতেছে, “হ্যাঁ, এ  
ঠিক কথাই বটে। জাত-বাপরে, আমাদের আর  
আছে কি? জাত যদি যায়, আমরা তবে বেঁচে মরে  
থাকব যে!”

হ্যাঁ, এ যথার্থ সত্য কথাই বটে। হিন্দুর আর কিছু  
নাই, গর্ক করিবার মত বাহ্য কিছু ছিল, সবই তাহারা  
হারাইয়াছে, তাহারা এখন আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে

এই জাতিটারে। এত বড় বাভিচার—ভাবিবার কথা নয় কি ?

ভবশঙ্কর খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষটা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “পবিত্র যাকে বিয়ে করে এনেছে, সে যে যথার্থ বেষ্ঠার মেয়ে সে প্রমাণ তুমি আমায় নিতে পারবে ?”

রামময় বাবু বলিলেন “নিশ্চয়ই পারব। আপনি শোনা কথায় বিশ্বাস করতে চান না, এ তো ভাল কথা। পবিত্রের দাদাশ্বশুর শুনছি এসেছেন, তাঁকে ডাকুন, সকলের সামনে তিনি নিশ্চয়ই এ কথা গোপন করে রাখতে পারবেন না।”

“সেই ভাল কথা—”

ভবশঙ্কর পিছন ফিরিতেই দেখিতে পাইলেন, পবিত্রকে। সে প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাহার বুকের রক্ত জমিয়া আদিয়াছিল। অজ্ঞ তাহার চির গবিত, চিরমান্য পিতা সমাজের চোখে একরূপ অবমানিত হইলেন, ইহার কারণ কি সেই নয় ?

“পবিত্র—”

পিতা গর্জিয়া উঠিলেন “যা—তোার আদরের দাদা-শ্বশুরকে ডেকে আন।”

ধীরে ধীরে পবিত্র সরিয়া গেল, ভবশঙ্কর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন—“অপদার্থ—” এই কথাটি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল।

ভলধরের আগমন পাপের পানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। গৃহদেবতার দামোদর—অজিকান এই দাক্ষণ অপমান হইতে নোমাদ টির-সেবককে রক্ষা কর। বুদ্ধ যেন একেবারেই অতীকার করে, সামময়ের এ কথা সর্ব্বথা মিথ্যা হোক, ভগবান, নোমাদ টির-সেবককে এ অপমান অবহেলা হইতে বচাও।

অন্যার মধ্যে তখনও মুক্ত গুহন উঠিতেছিল, মাথপানে দাঁড়াইয়া রামময় বাবু। তাঁহার মূখপানি পুণ্যকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুটা দীপ্ত।

ধীরে ধীরে ভলধর আসিয়া ভবশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তিনি পবিত্রের মুখে অল্প হুচার কথায় ব্যাপারটা কতক শুনিয়াছেন মাত্র, বিশ্বের কাগিমা তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, চলিতে গিয়া পা দুখানা থর থর কাঁপিতেছিল। কতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন, ঘুণায় হুখে লজ্জায় ভবশঙ্কর একটা কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না।

অনেক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন “ব্যাপারটা শুনতে পেয়েছেন?”

জলধর উত্তর দিতে গেলেন, কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল—  
“হ্যাঁ।”

“এর বিরুদ্ধে কোনও কথা আপনার বলবার আছে কি? আমি আপনাদের অপরিচিত, একটীবার মাত্র আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আপনার নাতনির সঙ্গেও তাই। পবিত্রও আপনাদের পরিচয় বিশেষ জানে না; ছেলে মানুষ সে, খেলার যৌঁকে আমার কিছু না জানিয়েই বিয়ে করেছে। আপনাদের কৈফিয়ৎ আপনাদেরই দিতে হবে, আমরা দিতে পারব না।”

একটু ধামিয়া বিরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন “শুধু আমারই নয়, পবিত্রেরও মান সম্মম মর্যাদা আপনার একটী কথার পরে নির্ভর করছে। সমাজের চোখে এখন একেবারেই ঘৃণ্য হতে পারি—শুধু আপনার একটী কথায়। বলুন, উত্তর দিন—”

জলধর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। পৃথিবী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তখন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, ভব-শঙ্করের কথা কাণে আসিতেছিল, চোখে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না।

তাঁহার ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভবশঙ্কর বলিলেন “বলুন—  
উত্তর দিন, আপনার নাতনি যথার্থ রেশমপত্নী হইয়া কিনা ?  
বলুন সে—”

বিস্ফারিত নেত্রে জলধর শুধু তাহার পানে চাহিয়া  
রহিলেন ।

অস্থির ভবশঙ্কর তাঁহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া  
বলিলেন “এখনও চুপ করে দেখছেন কি ? বলুন, সত্যি না  
তাকে ব্যক্ত করে দিন । বলুন—সে আপনার মেয়ের  
সন্তান, আপনার মেয়ে—”

“হ্যাঁ—সে পতিতার গর্ভজাতা, আমার মেয়ে—”

“হতভাগ্য—নরাধম”

ভবশঙ্কর এত জোরে জলধরের হাতখানা ছুড়িয়া  
ফেলিলেন যে জলধর সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া হুমুড়ি  
খাইয়া পড়িলেন ।

জনতাব পানে ফিরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন  
“যথার্থ কথা এ । রামময়, আমার জিনিস পত্র নষ্ট হল,  
হোক, আমার অনেক অর্থ অপব্যয় হল—তাও হোক,  
আজ আমার পরম বন্ধুর কাজ করেছে তুমি, আমার এত-  
শুলি লোকের জাতিপাতরূপ মহাপাতক হতে রক্ষা করেছে ।  
ভগবান আছেন, নইলে আজ যথার্থ আমার সর্বনাশ হত ;

এতবড় একটা পাপ আমার দ্বারা ই সমাজে আজ চলন  
হয়ে যেত।”

একবার জলধরের পানে তীব্র অন্তঃ চোখে চাহিয়া  
দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন। জনতাও ক্রমে ক্রমে  
চড়াইয়া পড়িল। থাওয়া না হোক, জাতি তো বাঁচিয়া  
গেল, ঐদরে প্রবল ক্ষুধার তাড়না সত্ত্বেও সকলেই এ কথা  
মানিয়া লইল।

৩

নির্জন গৃহের মধ্যে পড়িয়া মুহম্মান পূরবী, পার্শ্ব  
বাসী বৃদ্ধ জলধর।

আজ সাস্তুনার এমন কোনও ভাষা নাই, যাহা জলধর  
তাঁহার এই কাতরা নাতনীটির হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে  
পারেন। তিনি তাঁহার স্নানস্থান নিজে হৃদয় দিয়া অনুভব  
করিতেছিলেন, তাই তিনিও আজ এ মুহূর্তে নির্বাক।

নিজের হাতে তিনি আজ তাঁহার বড় আদরের নাতনীর  
সর্বনাশ করিলেন, তাঁহার আশ্রয় ঘুচাইলেন। ইহার বেশী  
বহুলা আর কিসে থাকিতে পারে, এ অপেক্ষা ভয়ানক  
কথা আর কি হইতে পারে? অগতে পূরবী ছাড়া তাঁহার  
আর আছে কি ?

কিন্তু তথাপি তিনি তো এ জীবন্ত সত্যকে গোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি তো জানিতেনই এ ঘটনা একদিন ঘটতে পারে, তাঁহার পূর্ববী একটীমাত্র কথায় রাজ্যরানী হইতে পথের ভিখারিণীরও অধম হইতে পারে। পবিত্র যখন তাঁহাকে ডাকিতে গেল, তখন তিনি তাহার মুখে সামান্য ওই একটা কথা শুনিয়াই বুকিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেই প্রতি মুহূর্তের অপেক্ষিত দিনটা আসিয়াছে। এ দিনে পিছাইয়া গেলেও যে ফল, - অগ্রসর হইলেও সেই ফল। যে সত্য ভগ্নাচ্ছাদিত ছিল, একবার মাত্র নাড়া পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা সেই ভগ্নকেও নিজের রূপ দান করিয়া ফেলিয়াছে, মিথ্যা সত্যের স্পর্শে জীবন্ত সত্যরূপেই বিকাশ পাইয়াছে। ইহাকে এখন কি দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়? লোহ পর্যন্ত ইহার শক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়িবে যে।

তিনি গোপন করিতে পারিলেন না, এই অবশ্য প্রকাশ্য কথার উপর আর কথা বলা সাজিবে না বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, হাঁ, সে তাহাই, যাহা লোকে বলিতেছে।

পূর্ববীর পরবর্তী অবস্থার কথা যখন মোটামুটি ভাবেই ধরিয়াছিলেন, তাহা যে এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাতেও আসে নাই।



সারাদিন প্ৰবী আজ জলস্পর্শ করে নাই। বধূবেশ তখনও তাহার নেই, যে মুহূর্তে এই ভয়ানক কথাটা কাণে আসিল, তাহার চারিপাশের মেয়েরা যখন স্বগার সহিত পতিতার মেয়ে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখনই সে বাতাহত কদলীর প্রায় লুটাইয়া পড়িল। তার পর কখন দাদামহাশয় আসিয়া পার্শ্বে বলিয়াছেন, সে তাহার কিছুই অবগত নয়।

অত বড় বাড়ীখানা—অত গোলমাণ সব নীরব; বাড়ীতে যে মানুষ আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না। ঐচ্ছিকালিকের কুহকময় দণ্ডস্পর্শে মুহূর্তে কোলাহল সঞ্চারিত সৌধ যেন নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

দাস দাসীগণ এঘর ওঘর করিতেছে, অতি সম্ভরণে, যেন কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, একটু শব্দ হইলেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ভবশব্দর সেই ছপূর হইতে উপরের ঘরে গিয়া ঘর-রুদ্ধ করিয়াছেন, পবিত্র কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আজকার এই কাণ্ডের সেই যে মূল, তাহাতে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। উমা ঠাকুর-গৃহে পড়িয়া ছিলেন, বার-বার মাথা খুঁড়িতে-ছিলেন, তাহার আঁর্ত স্বরটা এক একবার কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল—ঠাকুর, এ কাহার পাপে ?

যাহারই পাপে হোক, উমার মনে হইতেন, এই সময়টায় পবিত্রের মা যে নাই এ ভাগই হইয়াছে। তাঁহার বৃকে যে আঘাত লাগিয়াছে, পবিত্রের মায়ের বৃকে যে ইহার চেয়েও বেশী আঘাত লাগিত এই তাঁহার ধারণা। অল্প সময় তিনি স্বর্গগতা ভগিনীর জন্ত শোক করিলেও এই সময়টা প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিলেন “বেশ করেছ ঠাকুর, দিদিকে তুমি নিরেছ, কিন্তু আমার কেন এর আগে” নিলে না দেব, তা হলে আমাকেও তো আজ এ জালা সহ্যেতে হত না।”

সকলের চেয়ে বেশী মন্থে আঘাত লাগিয়াছে কাহার? পূরবী ভাবিতেছে আমি গিয়াছি, একেবারেই মরিয়াছি; আর যে তাহাকে জীবনাপেক্ষা ভালবাসে, সে ভাবিতেছে আমিই আমাকে হত্যা করিলাম, নারায়ণ, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

সন্ধ্যার মুহূ অন্ধকার বাহির আচ্ছন্ন করিবার আগে গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাহিরে তরল অন্ধকার ক্রমে ঘন গাঢ় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, গৃহের অন্ধকার তত বেশী বাড়িতে লাগিল।

“মাগো—মা—”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করিয়াই

পূরবী চম্কাইয়া উঠিল--হা ভগবান, এ শব্দটা মুখে  
আনিবার চেয়ে না আনাই যে ভাল। কে তাহার মা,  
পতিতা একটা নারী, যে নিজের দেহ বিক্রয় করিয়া--

“নারায়ণ,” আর্জুভাবে অভাগিনী কাদিয়া উঠিল,  
“পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধন হতে আমায় বঞ্চিতা করলে প্রভু?  
যাকে দেখিনি যাকে তোমার উপরে তান দিয়েছি, তাকে  
এমন করে আমার চোখের সামনে আঁকলে? আমার মা  
বলে ডাকবার অধিকারটুকু দিলে না গো?”

মৎস্তকে ভাল হইতে স্থলে তুলিলে সে যেমন কদিয়া  
আছড়াইতে থাকে, মাতৃনাম-কিত্যাত পূরবীও তেমনি  
ছটফট করিতে লাগিল; নিজের চক্ষে বসিয়া দাদামহাশয়  
দেখিতে লাগিলেন, তথাপি মুখ ফুটিয়া একটা সাস্তনার  
বাণী তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল,  
হুই হাতে দাদামহাশয়ের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া  
উন্মাদিনীর মত বলিল “দাদামশাই—দাদামশাই, সত্যি কথা  
বল, সত্যি বল, আমার মা, তোমার- মেয়ে, সত্যিই সে  
পতিতা একটা নারী ছিল? সেই পতিতা নারী—যারে  
দেখলে ঘৃণায় লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাদের ইহলোক  
আছে পরলোক নেই, যারা এই দেহটাকে কেনা-বেচার

জিনিস মনে করে—দাদামশাই, বল দাদামশাই, আমার মা ঘর অদেখা মূর্তিটাকে মনের মধ্যে কল্পনা করে নিয়ে আমি সতীরাণী ভূগা-মূর্তিকে দেখেছি, আমার সেই মা—  
সে মা নয়, মেয়ে নয়, বোন নয়, সে পতিতা—সে স্বর্ণা পতিতা নারী মাত্র। দাদামশাই, আজ আমার ভুলিয়ে না, জগতের সামনে ঘর নগ্নমূর্তি বেরিয়ে পড়েছে, আমার সামনে তাকে ঢাকতে চেয়ে না, জগতের চোখে যে পতিতা মূর্তিতে প্রকাশ হয়েছে, আমার সামনে তাকে সতীমূর্তিতে প্রকাশ করতে চেয়ে না; সত্যি বল দাদামশাই তোমার পারে পড়ি, সত্যি বল সে যথার্থ কি—”

“সে যথার্থই তাই দিদি, সে মহিমময়ী সতী নয়, সে নরকের প্রেতিনা, সে রাক্ষসী।”

। ভাঙ্গাকার করিয়া কাঁদিয়া পূরবী দাদামশায়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত কর্ণে বলিল “তবে কেন দাদামশাই, সব জেনে শুনে পতিতার মেয়ের বিয়ে দিলে কেন? যদি বিয়ে না দিতে—তবে আজ এমন করে তোমার মেয়ের আমার মায়ের কলঙ্ক জগতে প্রকাশ হতো না, মা বলে ডাকতে গিয়ে এরকম স্বর্ণাঘাট আমার বুকে ছিঁড়ে পড়ত না। আমার এনে এঁদেরও অপমান সহিতে হত না। তুমি কি করলে দাদামশাই, পতিতার

মেয়ে বিয়ে দিয়ে সবদিকে আগুন ধরিয়ে দিলে যে। এ আগুনে আমিই যে আজীবনকাল জলে মরব দাদামশাই ! তোমার পুত্রীকে তুমি বড় ভালবাস বলেই কি তাকে এমনি করে বেড়াআগুনে ফেললে গো ?”

“দিদি আমার” চে'খের জল বুদ্ধ আর চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। “বুঝতে পারি নি দিদি, মহুর্ষের জন্তে আপনহারা হয়ে গেছলুম। এতদিন অনেক আগেই যে তো'র বিয়ে হয়ে যেত পূরবী, অনেক পাত্রই তো এসেছিল ; মনে তখনও এ জ্ঞানটা জেগে ছিল, তাই তাদের সব ফিরিয়ে দিলুম। পবিত্রকে ফিরাতে পারলুম না, ভাবলুম, আর কেন ? তো'র জীবনটাকে সুখময় করবার লোভ আমি সামলাতে পারলুম না, তো'র বিয়ে দিলুম।

দাদামহাশয়ের বৃকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া পূরবী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে নিজেই শান্ত হইল। মুখখানা তুলিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, “দাদামশাই, একবার বলো সে কথা—আমার পাপিনী মায়ের কথা, তুমি তো সবই জানো।”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জলধর বলিলেন, “জানি দিদি, সব কথা তোকে এক দিন বলব ভেবেছিলুম। তার পর

তুই নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করতিস, ভগবানের ইচ্ছায় তা হল না।”

“আঃ, তা যদি বলতে দাদামশাই, কখনো আমি বিয়ে করতুম না।”

ছুই হাতে সে মাথা টিপিয়া ধরিল, হৃদয়ের উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত করিয়া বলিল “বল দাদামশাই।”

তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে দাদামহাশয় বলিলেন, “সে কথা এখন শুনবি দিদি? হ্যাঁ, এখনই শোন, এখনই এই অপমানের মধ্যে দিয়েই সেটা শুনে নে। তোর দিদিমা তোর মা বিধবা হওয়ার পরেই মারা যায়। বিধবা মেয়ে তারাকে আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম, কেউ যেন তার নাগাল না পায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাকে আটক করে রাখতে পারলুম না। একটা রাতের ভোরে আমি ঘুম হতে উঠে আর তাকে দেখতে পেলুম না।

কোথায় গেল সে, খুঁজি খুঁজি কোথাও তার দেখা পেলুম না, অবশেষে আমি আশা ছেড়ে দিয়ে বসলুম, জানলুম সে মরে গেছে, সে আর নেই।

বছর আট নয় পরে তার খোঁজ পেলুম। অভাগিনী ব্যারামে পড়ে আমার খবর দিয়ে পাঠিয়েছে, একবার শেষ

দেখা দেবার জন্তে। তার সুখের সাধীরা তখন তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে, তার আর কেউ তখন নেই যে তার মুখে একখোঁটা জল দেয়।

কিছুতেই থাকতে পারলুম না। ভাবলুম, যাব না, সে কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখব না, কিন্তু থাকতে পারলুম কই? স্নেহ যে নিয়গামী, নদীর স্রোত যেমন বয়েই যায়, ফেরে না, এই স্নেহও তেমনি একটানা চলেছে, এ আর ফেরে না। থাকতে পারলুম না বলেই বেরিয়ে পড়লুম।

গিয়ে দেখলুম, সত্যি তার দুর্দশা তখন চরম সীমায় দাঁড়িয়েছে। সে একখানা গোলার ঘরের বারান্ডায় মাটির ওপরে পড়ে আছে, মৃত্যুর কালিমা তার সারা মুখখানায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সে, একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে, তার মাথার কাছে বসে একটা ছ'বছরের শিশু, মাগো, মাগো বলে কাঁদছে।

হা অভাগিনী, আমার হৃচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ভেবেছিলুম, ক্ষমা করব না, কিন্তু ক্ষমা করলুম, তার মাথা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলুম।

সে কিছুতেই মরতে পারছিল না, মেয়েটিকে কার কাছে সে দিয়ে যাবে, কে তার এই পাপের চিহ্ন গ্রহণ

করবে? কেউ যে নিতে চায় না। পতিতা কেউ কেউ মেয়েটাকে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজের স্বার্থে এসেছিল, তা সে বুঝেছিল, তাই মেয়েটা যাকে এম পথে না আসে, মরতে গিয়েও সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল। না, সে কিছুতেই তার মেয়েকে এ নরকে দেবে না, তার মেয়েকে সে বাঁচিয়ে যাবে। নিজের ইহ পরকাল সে নষ্ট করেছে, সে বুঝেছে নরক কি।

আমার হাতে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে সে চোখ মুদণ্ডে। সে মেয়ে কে দিদি, তাও কি বলতে হবে, সে মেয়ে তুই,—সে তুই পূরবী।

অর্ন্তভাবে পূরবী বলিয়া উঠিল “দাদা, দাদামশাই—”

দাদামশায় ও নাতনী উভয়ের চোখের জলে দুক ভাসিতে লাগিল।

বাড়িরে খটখট খড়মের শব্দ শুনা গেল, পরমুহূর্তেই ভবশব্বরের গম্ভীর কথা ভাসিয়া আসিল “পবিত্র—”

পবিত্র বাড়ীর সীমানাতেও ছিল না।

“উমা—”

ঠাকুর ঘর হইতে উমা উত্তর দিলেন।

“উমা, সেই বেণ্টাকন্ডা আর তার দাদামশাই কি এখনও আমার বাড়ীতে আছে? আমার পবিত্র



পিতৃভিটে কি এখনও তাদের পাদস্পর্শে কলঙ্কিত হচ্ছে ?”

ত্র্যম্বকঠে উমা বলিলেন “দেখি নি দাদামশি ।”

ভবশঙ্কর গর্জিয়া বলিলেন “যদি থাকে—এখনই বার হয়ে যেতে বল, এই রাত নটার একখানা ট্রেন আছে কলকাতায় যাবার। ঝিকে বলে দাও দেওয়ানকে বলতে, যেন একখানা পাকী এখনই ঠিক করে দেয়। এখনই যাওয়া চাই, নইলে—”

“দাদামশাই—” পূরবী উচ্ছ্বসিতা হইয়া কাদিয়া উঠিল, “ওরা একটা দিনও আমাদের এখানে থাকতে দেবে না ।”

অন্ধকার গৃহে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। দাদামশাই সেই অন্ধকারেই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “তা তো দেবেই না দিদি। ওদের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্কই যে চূকে গেল ।”

“সব গেল দাদামশাই, সব গেল—”

পূরবী শুধু ফুলিতে লাগিল, চোখে আর জল আসিতে ছিল না।

ভেজানো দরকার একটু ফাঁক দিয়া আলোক রেখা আসিয়া গৃহমধ্যে পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলিয়া গেল, একটা লণ্ঠন হস্তে দরজার দাঁড়াইয়া উমা।

“বউ মা—”

মুহুর্তে পূরবী আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, না, ইহাদের কাছে কিছুতেই দুর্জয়তা প্রকাশ করা হইবে না, এখন শক্ত হইতে হইবে—বুক পাষাণে বাঁধিতে হইবে।

সে উত্তর দিল না, বউ মা আহ্বান—এ যে বিজ্ঞপ মাত্র। সে তো বউমা নয়, এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার আর সম্পর্ক কিসের।

উমা ডাকিলেন “পূরবী—”

“কেন” বড় ক্ষীণকণ্ঠে পূরবী উত্তর দিল।

“এ দিকে এসো মা, একটা কথা শোন।”

রুদ্ধ কণ্ঠে পূরবী বলিল “আমি সবই শুনেছি মা, আপনি পাকী আনতে আদেশ দিন, আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের এই গহনাগুলো—”

গহনাগুলো সে খুলিয়া পার্শ্বে রাখিয়াছিল; কাপড় জামা ইহারই মধ্যে খোলা হইয়া গিয়াছে; সেই কাপড়ের উপর গহনাগুলো তুলিয়া সে উমার পায়ের কাছে রাখিল।

এ দৃশ্যে উমার চোখ দিয়া কয়েক ফোটা জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন “কেন মা, এ সব গা হতে খুলেছ?”

স্থির কণ্ঠে পুরবী বলিল, “এসব আর আমার কি অধিকার আছে মা, আমার সব সম্পর্কই যখন উঠে গেল, আমি যখন এক নিমেষে সব হারালুম, মিথো এ ভার বইবার আর কি দরকার আমার মা ? আমি তো আর আপনাদের কেউ নই। বাড়ীর দাসীরও যে অধিকার আছে, আমার—”

বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণে অসমর্থ। উমা আলোটা ধপ করিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইলেন।

খিড়কীর দরজায় আসিয়া পাকী দাঁড়াইল; ভবশব্দ উপরের বারান্দা হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া আদেশ দিলেন “উমা, ওদের যা যা জিনিস আছে, নিয়ে চলে যেতে বলে দাও, পাকী এসেছে।”

টিনের বাক্সটা বাড়ীর ভূত্যা বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের কম্পিত হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া পুরবী অগ্রসর হইল। যাইবার সময় একবার উমার সহিত দেখা কল্লিবার ইচ্ছা ছিল, একবার পবিত্রের পা ছুখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

অন্ধকার ভেদ করিয়া পাকী নির্ঝাক দুইটা প্রাণীকে বহন করিয়া স্টেশনের পথে ছুটিল।

## ৬

তাহার পরেও দুই দিন চলিয়া গেল, পবিত্রকে কোথাও পাওয়া গেল না। উমা ঠাকুর ঘরে পড়িয়া অসহায়ে অনিদ্রায় কাঁদিতেছেন, ভবশঙ্করের মুখখানা অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদিও তিনি বাস্তবতা প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তাহার মুখ দেখিলেই তাহার মনের উৎকণ্ঠা সহজেই ধরা যাইতেছে।

দুই দিন পরে তিনি বাহিরে আসিলেন, সম্মুখেই পড়িয়া গেলেন দেওয়ান বনমালী রায়। ভবশঙ্করের কালিমামাথা মুখের পানে চাহিয়া তিনি আন্তে আন্তে সরিয়া পড়িতে-  
ছিলেন, কণ্ঠ সংযত করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন, “দেওয়ান, পবিত্রের কোনও খবর জ্ঞান কি?”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বনমালী বলিলেন “না।”

“না?” ভবশঙ্কর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; একটু পরে বলিলেন “কেউ তার কথা বলতে পারলে না, কেউ তাকে দেখেনি?”

তাঁহার কণ্ঠে যে কি আকুলতা বাজিয়া উঠিল, তাহা বনমালী বুঝিলেন। পিতার বেদনাতুর হৃদয় এইখানেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। কঠোরতার আবরণে এ কি

গোপনে রাখা যায়, এ কি লুকাইয়া থাকিবার জিনিস ?  
আঘাত পাইলেই এ যে প্রকাশ হইয়া পড়িবে ।

মাথা নাড়িয়া বনমালী বলিলেন “কেউ না বাবু, কেউ  
তার কথা বলতে পারেন না, কেউ তাকে দেখেনি ।”

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন “তবে সে  
কোথায় গেল ?”

হুই হাতে দেওয়ানের দুইটা হাত ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে  
ভবশঙ্কর বলিলেন “পবিত্র শুধু আমারই নয় বনমালী, সে  
তোমারও ছেলে, বরং আমার চেয়ে সে তোমাকেই বেশী  
চেনে, বেশী ভালবাসে । বনমালী, এ সংসারে আমার  
পবিত্র ছাড়া আর কেউ নেই, আমার জীবন সর্বস্ব ওই  
ছেলেটা । পবিত্র তোমারও তো তাই বনমালী, তোমারও  
এ জীবনে পবিত্র ছাড়া আর আছে কে ? তুমি কি কাজে  
যাচ্ছ, জমীদারির কাজে ? ফেলে দাও কাগজপত্র, কেলে  
দাও সব । পবিত্রকে বেথান হতে পার নিয়ে এসো । আমার  
বাড়ী একেবারে শূণ্য হয়ে গেছে, আমার বুক একেবারে  
খালি হয়ে গেছে । আমার সর্বস্ব যাক বনমালী, আমার  
পবিত্রকে শুধু তুমি এনে দাও, তার মুখখানা একবার  
আমার দেখাও ।”

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেওয়ানের হাত

ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সম্মুখের গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন।

বনমালী আগেই পবিত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; সে পার্শ্ববর্তী গ্রামে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। পিতৃস্নেহ কতদূর, এই স্নেহ-সমুদ্রের মধ্যে রসি কেলিয়া তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। এইবার নিশ্চিন্ত মনে পবিত্রকে আনিতে তিনি যাত্রা করিলেন। মনটা অত্যন্ত শূণ্ডিযুক্ত, যেহেতু পবিত্রকে পিতার বোবাগ্নিতে আর পড়িতে হইবে না।

ভবশঙ্কর নিদারুণ মর্দ্যযন্ত্রণার ছটকট করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, যত ক্রোধ সব গিয়া পড়িতেছিল পূরবীর উপর। ভগবান না করুন, যদি পবিত্রের কিছু হইয়া থাকে, তিনি পূরবীর বক্ষে সহস্রে অস্ত্রাঘাত করিবেন। হোক নারী-হত্যা, সে নারীকে অনায়াসে হত্যা করিতে পারা যায়, যে পিতার স্নেহময় বক্ষ হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া লয়। এ রাক্ষসীকে হত্যা করায় পাপ অর্শে না।

বৈকালে বনমালী ফিরিলেন, ভবশঙ্করকে সংবাদ দিলেন পবিত্র আসিয়াছে, সে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সাহস করিয়া পিতার সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না।

ভবশঙ্কর একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, মুখ হইতে অন্ধকারের রেখাটা সরিয়া গেল।

চোরের মত পবিত্র আসিয়া দরজার ভিতরে দাঁড়াইল।

ভবশঙ্কর অতৃপ্ত চোখে পুত্র মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কোথা গিয়েছিলে পবিত্র?”

পবিত্র কথা কহিতে পারিল না, ভয়ে লজ্জায় ঘুণায় সে মুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিতে পারিল না।

তাহাকে সম্মুখে বসিতে আদেশ দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে পিতা বলিলেন, “তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছে! কেন পবিত্র? ছেলেমানুষি বুদ্ধির বশে একটা কাজ করে ফেলেছিলে, আমাকে কিছু না জানিয়ে। তখনও আমি যেমন তোমায় ক্ষমা করেছিলুম, এখনও তেমনি তোমায় ক্ষমা করছি। সমাজে আমার উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার যা তাই হবে, সমাজে আবার আমি প্রভুত্ব করতে পারব। আমি সমাজের কর্তা, আমায় সমাজচ্যুত করবে, এত বড় ক্ষমতা কার আছে? সেদিনকার অপমান যার জন্তে, তাকে সেই দিনই দূর করে দিয়েছি। খেয়ালের দশ একটা কাজ করেছিলে, তার জন্তে তোমার ওপরে অশি ঋণদণ্ড অর্পণ করব না।”

পবিত্র স্তব্ধভাবে বসিয়াই রহিল, সে মুখখানাও তুলিতে পারিল না।

ভবশঙ্কর তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, “কিছু আশ্চর্য্যাম্পদী সেই পতিত কন্নার আর তার দাদামশায়ের,—জেনে শুনে ভদ্রলোকের জাত মারতে আসে, এতটা সাহস কারও হতে পারে না। তোমায় ছেলে মানুষ পেয়ে চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল, আমারও দিতে পারত যদি না সমাজ জ্ঞানে পারত। উঃ, দামোদর রক্ষা করেছেন। আমার পুত্রবধূ সে, দামোদরের পুজার যোগাড়ও হয় তো তাকে করতে হত, কোনও দিন না কোন দিন ভোগ দেবারও ক্ষমতা তার ছতো। কি হতো তবে—উঃ!”

অতঃক্ষে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, ললাটে হাত স্থানা ঠেকাইয়া বলিলেন, “তিনিই প্রকাশ করে দিলেন। মঙ্গলময় তিনি ভক্তের মঙ্গলই বাঞ্ছা করেন। আমার দামোদর বড় জাগ্রত, তিনি তো দুমস্ত দেবতা নন যে, যে যা করবে সব নিয়ে যাবেন। মানুষের সঙ্গে জুয়াচুরি চলতে পারে,—দেবতার সঙ্গে যদি চলত, তা হলে এ পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের পাথকা কিছুই থাকত না।”

বনমালী রার নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্য বাবুর দীর্ঘ লোকচারণ শুনিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। হতলাগিয়া পূরবীকে তিনিই সে রাত্রে টিকিট কিনিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। পূরবীর সেই শাস্ত অথচ শোকপূর্ণ



মুখখানার কথা তাঁহার মনে দেদীপ্যমান। সর্বস্ব দান করিয়া তেমনিই শাস্ত্রভাবে অকম্পিত পদক্ষেপে চলিয়া যাইতে পারে শুধু নারী, পুরুষ পারে না। তাহার চোখে তখন এক ফোঁটা জল ছিল না, মুখখানার উপরে তখন তাহার কি গম্ভীর ভাব ফুটিয়াছিল।

ট্রেণে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বৃদ্ধ বনমালী রায় কিছুতেই অশ্রু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। হার হতভাগিনী, মাত্র কয়দিন পূর্বে আনন্দ উজ্জ্বল বক্ষে এই দেশের মাটিতেই পদার্পণ করিয়াছিলেন না। তখন কত আশা ছিল তোমার বৃকে, স্থখের ভবিষ্যৎ চিত্র তুমি কতই না আঁকিয়াছিলে! আজ সব বিসর্জন দিয়া, অন্ধকার হৃদয় বাহির ভরিয়া লইয়া যাইতেছ কোথায়?

সে উদ্বেগ ব্যাকুল নেত্রে দূর গ্রামের পানে চাহিতে-ছিল, কিন্তু মাঝে যে সৃচিভেদ্য বিরাট বিপুল অন্ধকাররাশি, দৃষ্টি তাহার এ অন্ধকার ভেদ করিতে পারে কি?

ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধ বনমালী ঘুমাইতে পারেন নাই। স্বপ্নরাজ্য হইতে চির-নির্ধারিতা অভাগিনী পূর্ববীর মুখখানা কেবল তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার ব্যথা অমুভব করিয়া আর্তস্বরে তিনি ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন।

আজ ভবশঙ্করের দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ধীর কণ্ঠে বলিলেন “আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন আপনি, একটা কথা বলবার আদেশ আমি চাচ্ছি। ভগবান জাগ্রত, কিন্তু একজনের মঙ্গল করে আর একজনের অমঙ্গল করেছেন, এতে তাঁকে দয়াময় বলা যায় না।”

ভবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন “ক’র অমঙ্গল?”

বনমালী উত্তর দিলেন “যে মেয়েটা এসেছিল।”

জা কুণ্ঠিত করিয়া ভবশঙ্কর মুখ ফিরাইলেন।

সাহস করিয়া বনমালী বলিলেন, “রাগ করবেন না বাবু, আমি যা বলছি, এটা রাগের কথা নয়। আপনার এতে মঙ্গল হল, আপনার দেবতা তার স্পর্শ হতে নিরুত্তীর্ণ পেলেন, কিন্তু একটা সত্য কথা বলছি বাবু, দেবতা কি শুধু ওই একটা আধারেই চুষ্ট আছেন, না, সর্বত্রীবে, চরাচরের মধ্যে বিস্তারিত আছেন? সে পতিতার মেয়ে, এই তার অপরাধ, কিন্তু সত্যের দিক হতে চেয়ে বলুন, সেই পতিতার মধ্যেও কি নারায়ণ ছিলেন না? নারায়ণ জাগ্রত, সে তো ঠিক কথা। অর্য্যণ জীবজগৎ যখন বিস্তারিত রয়েছে, তার মধ্যে নারায়ণও রয়েছেন। জীবজগতের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা যেত,

নারায়ণের অস্তিত্বও আমরা অস্বীকার করতে পারতুম। আপনি জানী, কিন্তু সব বুঝেও এই বিষম ভুলটা করে ফেলেছেন যে বাবু, একটা পাথরের মধ্যেই আপনার দেবতাকে দেখেছেন, সর্বভূতে দেখতে পান নি। আর সে অভাগিনী, ধরে নিচ্ছি পতিতার মেয়ে সে, কিন্তু সে কি পাপে পতিতা হয়েছে? সে নিজের পবিত্রা, নিষ্ঠাচারিণী, তার শুচিতাই কি তাকে তুলে দেবে না, পতিতা মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই যে করতে হবে, এমন কোনও কথা আছে কি?”

ধীর স্বরে ভবশঙ্কর বলিলেন, “যদি এই হিসাবেই কথাটা বলে থাকে বনমালি, তবে এই কথার শেষ আনায় এই ধানেই করতে দাও। সমাজ গঠন হয়েছে ধর্মের জন্ত, সমাজকে হেলা আমরা কখনই করতে পারব না। সমাজের অনুবর্তী হয়ে শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে, এই হচ্ছে সমাজের উদ্দেশ্য। সত্যকে চিনতে পেরেছি, কিন্তু তা বলে সমাজের বিরুদ্ধে চলতে পারব না। আমাদের মধ্যে এমন ঢের লোকই তো আছে যারা বলে, বিশ্বাস করে, সর্বজীবে ঈশ্বর বিদ্যাজিত, তবু কেন তারা ভিন্ন ভাবে চলে, শুচিতাকে কেন বাঁচিয়ে যায়? মেয়েদের কথা আমি ধরিনে, কারণ অন্তরেই তারা খুব বেশী করে

ধরে নেও,—আমি পুরুষদের কথা বলছি। যারা মহামহো-  
পাধায় পণ্ডিত, যাদের হৃদয় জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসিত,  
তঁরাই বা কেন এতদূর স্পৃহা স্পৃহা বেছে চলেন? অনেক  
হিন্দুর রান্না ঘরের চালে মুরগী বসলে কেন তঁরা ঘরের  
ভিতরকার জিনিস পত্র ফেলে দেন? কুয়া ইঁদারা—এ সব  
অশ্রু জাতি দ্বারা কেন তঁরা স্পৃষ্ট হতে দেন না? এই  
বিচারটাকে তঁরা সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন,—  
এই বিচারের বশেই পতিতার মেয়ে কিছুতেই সমাজে  
প্রবেশলাভ করতে পারবে না, সমাজের দ্বার তার কাছে  
চিররুদ্ধ। পতিতার ছেলে অথবা মেয়ে তাদের পতিতা  
মায়ের পাপের ফল ভোগ করবেই, সমাজ তার শুদ্ধাচারিতা  
জানলেও তাকে গ্রহণ করবে না। অস্বীকার করছি  
নে, জ্ঞানীর হৃদয়ে যে ভগবান আছেন অজ্ঞানীর  
হৃদয়েও তিনি আছেন, পুণ্যাত্মার মধ্যেও মীন, পাপাত্মার  
মধ্যেও তিনি। সবাই যদি সেটা বুঝে চলত, পাপীকে  
ক্ষমা করত, বিধব্রীকে সমান অধিকার দান করত,  
আমিও করতে পারতুম। সমাজে বাস করতে গেলে,  
সমাজের অনুশাসন মেনেই আমার চলতে হবে,  
সে ব্রহ্ম স্থলে সত্যকেও গোপন করে রাখতে  
হবে।”

বনমালা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। পিতার সম্মুখ হইতে পবিত্রও উঠিয়া গিয়া বাচিল।

উমার সহিত তাহার দেখা হইল, উমা নিঃশব্দে তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে ঢাপিয়া ধরিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অভাগিনী পূরবীর মর্মানভেদী উচ্ছ্বাসের কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। পূরবীর এ সর্বনাশ তাঁহার পবিত্রের দ্বারা হইয়াছে, তাই তিনি নীরব, অন্য কেহ হইলে তিনি বোধ হয় রাগিয়া উঠিতেন।

পবিত্রের অবিহ্বল চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “কাজটা মোটেই ভাল হয় নি পবিত্র। আহা, সরলা বালিকা সে, কিছু জানে না, তার ওপরে এই গুরুদণ্ডটা দেওয়া উচিত হয় নি। আচ্ছা পবিত্র, একটা কথা তোকে আমি জিজ্ঞাসা করি, বিয়ের আগ্রহটা তোর বেশী ছিল, না, তাদের বেশী ছিল?”

“আমার মাসীমা—” পবিত্র মাসীমার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল, মুখ তুলিতে তাহার লজ্জা বৃদ্ধিতেছিল।

“তোর ছিল? তুই যখন তাদের বলেছিলি, তারা তখনি রাজি হয়েছিল কি?”

পবিত্র মুখ তুলিল, বলিল, “না মাসীমা, তারা প্রথমে

কিছুতেই রাজি হয় নি। শেষে আমার ভেদে পড়েই বুড়ো বিয়ে দিতে রাজি হল।”

মাসীমা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন,  
“আচ্ছা যা এখন।”

নীরব শয়ন গৃহে পবিত্র একা।

তাহার মনে হইতেছিল, সেই দিন তপু্রে পলায়নের পূর্বমুহূর্ত্তে একবার পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মতন সে এই গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; তখন পূরবী ধলায় মুর্চ্ছিত প্রায় পড়িয়া। চোথের জলে ওই খানটায় ঢেউ খেলিয়া যাইতে-ছিল, এখনও যেন সে জলের দাগ সেখানে রহিয়াছে।

কি অসহ্য মর্ষবেদনাতেই সে কাঁদিতেছিল। বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু সে লাভ করিয়াছিল, ভগবানের চোথের একটা ভ্রুকুটীতে সে সব হারাইয়া ফেলিয়া, অবশেষে ভিখারিনীর চেয়েও অধম হইয়া সে দেশত্যাগ করিল।

পবিত্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ওইয়া পড়িল।

৭

পূরবী ফিরিয়া আসিয়াছে।

পূরবী ফিরিয়াছে, কিন্তু যে পূরবী গিয়াছিল, এ সে পূরবী নয়। সে পূরবী হাসিতে হাসিতে সম্মুখে পূর্ণ

আশার আলোক দেখিয়া ত্রস্তপদে গিয়াছিল, এ পূরবী হৃদয়ে দারুণ অন্ধকার লইয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া, চোথের জলে ভাসিতে ভাসিতে ফিরিয়াছে ; তাই বলিতেছি, এ সে পূরবী নয়, এ পূরবীর ছায়া মাত্র ।

আর কথায় কথায় তাহার হাসি তেমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না, দাদামহাশয়ের সহিত সে কোতুক আর নাই । এখন জোর করিয়া যদিও সে হাসিতে যায়, সে চেষ্টাতে হাসি আসে না, আসিয়া পড়ে চোখে অশ্রু ; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সে পলাইয়া যায় । কাজ কর্তব্য নেহাৎ না করিলে নয়, তাও যদি নিজের জন্ত হইত, সে কিছুই করিত না, কিন্তু দাদামশাই যে আছেন তাঁহাকে যে খাওয়াইতেই হইবে ; তাই সে আবার তেমনিই— আগের মত প্রভাতে উঠিয়াই সংসারের কাজে লিপ্ত হয় । কিন্তু তাই বা কত ? সামান্য রন্ধন পরিবেশন, বাসন মাজা, জল তোলা ; অবকাশ হে গোটা দিন । সমস্ত দিনটা তবুও সে ভাবিবার সময় পাইত না, কিন্তু রাত্রি তো আছে ।

আনন্দপূর্ণ গৃহ একেবারে নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে, বীণা বাজিতে বাজিতে থামিয়া গিয়াছে ; তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাই এ বীণা আর বাজিয়া উঠে না । বৃদ্ধ দাদামশাই কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবেন,

এ আবার কি হইল ? আবার কি করিলে সেই আনন্দপূর্ণ দিন ফিরিয়া আসিবে ?

নাতনীর বিষাদ-মলিন মুখখানার পানে চান, আর তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া হাহাকারের শুর বাজিয়া উঠে। এক এক দিন তিনি তাঁহাকে ধরিয়া বই পড়িতে বসান, নিজে স্তব্ধভাবে শুনিতেন বসেন। শুনিতেন শুনিতেন মনটা কোথায় চলিয়া যায়, বইয়ের দিকে আর মন থাকে না। তাঁহার পর পড়িতে পড়িতে পূরবী হঠাৎ থামিয়া যায় ; দাদামশাইয়ের পানে চাহিয়া দেখে তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। তখন জিজ্ঞাসা করে, “শুনছো দাদামশাই ?”

দাদামশাই হঠাৎ চমকাইয়া উঠেন, সে চমকানিটা তাঁহার নিজের কাছেই অনুভূত হয়, তিনি লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বলেন “শুনছি বই কি দিদি, বেশ শুনছি। আর একবার ওই জায়গাটা পড় দেখি, কি পড়লি মনে হচ্ছে না।”

দাদামশাইয়ের অবস্থাটা মনে করিয়া গভীর বেদনায় পূরবীর হৃদয় ভরিয়া উঠে, বই বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে “আজ থাক দাদা, কাল তোমায় আবার শুনাব।”

কিন্তু এমন করিয়া তো দিন কাটে না। এ কি ভীষণ গোপন ব্যথা জাগিয়া ছুইটী হৃদয়ের মধ্যে ? হাসিতে গেলে



হৃদয়ের ক্ষততে আঘাত লাগিয়া কেন টন টন করিয়া উঠে ?  
এ ক্ষতকে শুষ্ক করিতে হইবে যে, ঔষধ দিতে হইবে যে ;  
দিন দিন বাড়িতে দিলে তো চলিব না ।

সে দিন দুপুরে পূর্ববী আহা-রা-স্তে ছাদ হইতে শুষ্ক  
কাপড় তুলিয়া আনিতে গিয়াছিল । নিচে দাদামশাইয়ের  
বাগ্র আহ্বান শুনিল “পূর্ববী—শিগগীর আয় দিদি, একটা  
মজা দেখে যা ।”

পূর্ব্বেকার একটী কথা পূর্ববীর মনে জাগিয়া উঠিল,  
সেদিনও দাদামশাই এমনি বাগ্র কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া-  
ছিলেন, ছুটিতে ছুটিতে নিচে গিয়া সে পবিত্রকে দেখিতে  
পাইয়াছিল ।

কাপড় তোলা ফেলিয়া পূর্ববী তাড়াতাড়ি নিচে  
নামিয়া গেল ।

“এই দেখ দিদি, তোর অঙ্গে কি এনেছি ।”

শুষ্ক লোম বিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটী কাবুলী বিড়ালের ছানা ।  
চোখ দুইটা তার স্নেহহিত, লোমগুলি খুব বড় বড় ।  
তাহার গলায় আবার রেশমী ফিতার মাথা গুটিকত  
ঘুঙুর ।

বিশুদ্ধ মুখে একবার চাহিয়া পূর্ববী কিরিবার উদ্বোধন  
করিল । বাগ্র দাদামশাইয়ের বলিলেন “যাচ্ছিস যে ?”

পুরবী বলিল “কি করব দাদা, ছাদে কাপড়গুলো সব পড়ে আছে, সেগুলো তুলে আনি গিয়ে। এই বৈশাখের বাতাস, উড়ে পথে গিয়ে পড়বে এখন।”

জলধর বলিলেন “এক আধ মিনিটেই উড়ে গিয়ে পড়েছে না। কেমন বিড়ালের ছানাটা বল দেখি।”

সংক্ষেপে পুরবী উত্তর দিল “বেশ।”

উৎসাহিত বৃদ্ধ বলিলেন, “তা একবার জিজ্ঞাসা কর কোথায় পেলুম। নরেনবাবুর বিড়ালের একটীমাত্র ছানা এ ; তারা কি কিছুতে দিতে চায় ? নেহাৎ আমি না কি নাছোড়বান্দা, তাই কত করে নিয়ে এলুম। তারা বলেছে, তিন দিন অন্তর একবার করে ছানাটাকে তাদের দেখিয়ে আসতে হবে, আর খুব বেশী করে মাছ দুধ খাওয়াতে হবে। তা হলে তো দিদি, মাছ দুধ একটু বেশী করে নিতে হবে, নইলে তো চলবে না।”

“আচ্ছা দেখা যাবে” বলিয়া পুরবী আবার ফিরিতেছিল, বিড়াল ছানাটির সম্বন্ধে তাহারেঁ এতটা উদাসীনা দেখিয়া বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া গিয়া বলিলেন “আবার যাচ্ছিস যে ?”

“ছাদে কাপড়গুলো—”

রাগত সুরে দাদামহাশয় বলিলেন “দূর হোক গিয়ে কাপড়, এটাকে তুই নিবি না আমি কোলে করে বসে থাকব ?”

বিড়াল ছানাটির সম্বন্ধে গোপন কথা পূরবীর মনে এবার ফুট হইয়া জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ দাদামহাশয় কোন কিছুর মধোই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিলেন না। নরেনবাবুর বাড়ীতে অজস্র অপমান স্বীকার করিয়াও তিনি শুধু তাহাকে একটু অগ্রমনস্ক করিবার জন্ত বিড়াল ছানাটি আনিয়াছেন। স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের কথা ভাবিয়া পূরবী তাড়াতাড়ি অতৃদিকে মুখ ফিরাইল, চোখের পাতা বার বার ফেলিয়া জলটুকু শুষিয়া লইয়া জড়িত কর্তে বলিল “বিড়ালছানা আমার কি করবে দাদা? আমি এই বিড়ালছানা নিয়ে কি করব? না, এ তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো—যদি আমার জন্তেই একে তুমি এনে থাক। আমি তো ছেলেমানুষ নই যে বিড়ালছানা নিয়ে খেলা করব।”

“তুই ছেলেমানুষ নোস? মাত্র পনের বছর বয়সেই এ অভিজ্ঞতাটা কোথায় লাভ করলি দিদি—?”

তাহার হাতখানা টানিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন “তোকে এই বয়সেই এত ভাবতে কে শেখালে পূরবী? তুই তো এক দিনও ভাবতিস নে, এক দিনও তো তোর চোখে জল দেখি নি, আমার সঙ্গে হেসে খেলেই যে তোর

‘দিন যাচ্ছিল। এই বিড়ালের ছানা নিবি বলেছিলি, বলেছিলি কাবুলী বিড়ালের ছানা যদি পাস, আরাকছু তুই চাস নে, আজ সে কথা’ তোকে কে ভুলিয়ে দিলে দিদি ? মাত্র পনের বছর বয়েসেই সকল সুখ সাধ বিসর্জন দিলি কার জন্তে দিদি ?’

“ও কি করছ দাদা—ও কি, ছিঃ, কঁাদছো কেন ?”

পূরবী তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চল দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল “পাগল হয়েছ না কি ? বা রে, কোথাও কিছু না—কৈদে বাড়ী মাথায় করছো। পরকম করে কঁাদতে আছে কি ? দিন দিন যেন তুমি ছেলে-মানুষের অধম হচ্ছো দাদা। চূপ কর বলছি—চূপ না করলে সত্যি আমি এমন রাগ করব যে—কিছু থাক না।”

দাদামহাশয় চূপ করিয়া গেলেন, খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। পূরবীও চূপ করিয়া দাদামহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

“একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া দাদামহাশয় বলিলেন :  
“তবে বিড়াল ছানাটাকে দিয়ে আসি ?”

পূরবী শাস্ত কণ্ঠে বলিল “না, দেবে কেন ? এনেছ যখন, থাক। ওর জন্তে মাছ ছুধের বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। ও বেশ খেলে বেড়াচ্ছে বেড়াক। তুমি ভাল

হয়ে বস দাও, তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে তার পর কাপড়গুলো তুলে আনব এখন। ইস্ তোমার মাথায় চুল যে একেবারে সব পেকে গেছে দাদামশাই, সত্যি তোমার চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।”

দাদামশায় হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন “আজই বুঝি তোর চোখে পড়ল পূরবী? ওরে, ও আজকের পাকা চুল নয়, চুল পাকতে শুরু হয়েছে সেই দিন যেদিন তারা আমার একলা ফেলে চলে গেল। তার পরে তোকে পেয়ে আমার পাকা চুল আবার কাঁচিয়েছিল রে, আমার যৌবন আবার ঘুরে আসছিল, হঠাৎ সেদিন স্বপ্ন টুটে গিয়ে দেখলুম, মিথ্যে স্বপ্নে ভুলে ছিলুম, আমার ডিঙিরে কোন দিন ত্রিশটা বছর চলে গেছে। আমি জোর করে দাঁড়াতে গেলুম; সেদিন সমাজের সামনে, কিন্তু ষাট বছরের বার্জিকা হঠাৎ আমার আক্রমণ করে আমার হাঁটু কাঁপিয়ে ফেলে দিলে, ষাট বছরের মাথা থর থর করে কেঁপে আর উঁচু হল না, ষাট বছরের দৃষ্টি-হীনতা ঘুরে এল। ওরে দিদি, বুকে ঢের আঘাত সরেছি, কিন্তু এ আঘাত কিছুতেই সইতে পারলুম না। উঃ, আমার বুকটার একটু হাত বুলিয়ে দে দিদি; দেখ একবার, বুকের মধ্যে আমার কি রকম করছে।”

পুরবী তাড়াতাড়ি তাঁহার বৃকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। পাণ্ডুর মখে দাদামশাই বলিলেন, “কি জানি, হঠাৎ কেন বৃকটায় এই রকম বাথা ধরা আরম্ভ হয়েছে। মাথা ঘুরে ওঠে, চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, মনে হয় প্রাণটা এখনই বেরিয়ে যাবে।”

উদ্বিগ্ন হইয়া পুরবী বলিল “একটা ডাক্তার ডাকব কি দাদা? এরকম করে অস্থখ পুষে রাখা—”

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া দাদামশায় বলিলেন “দূর, পাগল হয়েছিস নিদি? ওই সেরে গেল, ওর অস্ত্র ভাবনা? ভয় নেই, তোরা, ভয় নেই রে আমি এখনি মরব না, আমি মরলে তুই দাঁড়াবি কোথায়, কে তোকে দেখবে? ভগবান এমন আমার কক্ষনো নেবেন না। যা তুই, কাপড় তুলে আন গিয়ে, আমি ততক্ষণ একটু শুয়ে থাকি চুপ করে।”

এক কথাতেই বৃকের বাথাটা সারিয়া গেল, কিন্তু পুরবী আম্মুত্তী হইল না; তেমনি ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল “তা আনছি দাদা, পরে আনলেই চলবে এখন। তোমার বৃকটায় ততক্ষণ হাত বুন্টিয়ে দিই দাদামশাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাও দেখি। এই ঠিক দুপুরবেলা, তাই বৃকের মধ্যে তোমার আনচান করছে।”

ছোট শিশুর মত দাদামহাশয়কে শোয়াইয়া সে তাঁহার বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

৮

এম-এ পাসের খবর বাহির হইলে দেখা গেল, পবিত্র সম্মানের সহিত পাস করিয়াছে।

. বাড়ীতে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভবশঙ্কর গ্রামা দেবী চণ্ডীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা পাঠাইয়া দিলেন, বাড়ীতে দামোদরের ষোড়শোপচারে পূজা হইল, সোণার সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া মুক্তার কালর দেওয়া পাখা দ্বারা বাতাস করা হইল। অনেক দরিদ্র জমীদার বাটী হইতে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ করিল, গ্রাম স্ত্রী লোক এই উপলক্ষে জমীদার বাটীতে আহাৰ করিয়া গেল। আসিলেন না কেবল রামময়বাবু। বরাবর তিনি কখনই আসিতেন না, বউভাতের দিন ভবশঙ্করকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছাতেই তিনি আসিয়াছিলেন। আজ তিনি না আসিলেও কোনও ক্ষতি হয় নাই, যেহেতু কেহই সেদিকে অত দৃষ্টি দেয় নাই।

এই আনন্দ উচ্ছ্বাস তিনজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। একজন বনমালী। দুঃখিনী পুরবীর বিদায়কালীন

মুখখানা তাঁহার মনে জাগিতেছিল ; সে শোকদৃশ্য মনে করিয়া আত্মিকার এ আনন্দোচ্ছ্বাস মোটেই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না ; কিন্তু এ না করিলেও তো নয়, বেতন-ভোগী ভূতা যে তিনি । যদি তিনি বেতনভোগী ভূতা না হইতেন, তাহা হইলে আজ কখনই তিনি এ আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিতেন না ।

আর আত্মিকার এ আনন্দোচ্ছ্বাস হৃদয় শোকাকুল করিতেছিল পবিত্রের ।

পবিত্রের মুখ মলিন, চকিতে এক আধবার লোক দেখানো হাসির রেখা যদিও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা জোর করিয়া টানিয়া আনা মাত্র ।

হার, যদি আজ সে থাকিত—তবেই না সে যথার্থ আনন্দ পাইত ? হৃদয়ে বাহার আগুন জলিতেছে, বাহিরে প্রচুর জল গারে ঢালিয়া তাহার কি শান্তি ? এ সাকল্যে সে একটুও আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই ; তাহার মনে হইতেছিল, যে মরিতে বসিয়াছে তাহাকে আর সাজাইয়া লাভ কি ? শ্মশানে বাসর-শয্যা কেন ? যে হৃদয়ের শান্তি, আনন্দ চিরতরে হারাইয়াছে, তাহাকে শান্তি আনন্দ দিবার জন্ত কেন ঐ মিথ্যা প্রয়াস ?

পবিত্রের মলিন মুখখানা হঠাৎ কার্যনিরতা উষার



চোখে একবার পড়িয়া গেল ; তাঁহার মনেও না কি শাস্তি ছিল না ; তাই পবিত্রের মুখখানা দেখিবামাত্র তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন । নিঃস্বপ্নে তাহাকে ডাকিয়া বসাইয়া বলিলেন “সবাই আনন্দ করছে বাবা, তোর আনন্দ নেই কেন বল দেখি ?”

হাসি টানিয়া আনিয়া পবিত্র বলিল “আনন্দ নেই, সে কি কথা মাসীমা ? এমন দিন, এদিনে আমার আনন্দ থাকবে না ? আমারই পাসের খবর, আমারই জন্তে এত আয়োজন, খাওয়ানো, পূজা দেওয়া,—আমার আনন্দ হবে না তো কার হবে মাসীমা ?”

শেষের দিকে তাহার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যথা-বাক্সিয়া উঠিয়াছিল, স্মরণ কেমন যেন বদলাইয়া গেল, সে নিজে তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী উমা তাহা লক্ষ্য করিলেন ।

পবিত্রের মাথায় হাণ্ড দিয়া করুণ সুরে তিনি বলিলেন “আমার ভুল বোঝাতে চেষ্টা করিস্নে পবিত্র, তোকে আমি যতটা চিনি, এতটা আর কেউ চেনে না । তোর ঐ টেনে আনা হাসি দিয়ে তোর বাবাকে তুই ভোলাতে পারিস, কিন্তু আমাকে তুই ভোলাতে পারবিনে বাবা । আমি সব বুঝতে পারছি, সব জানতে পারছি, কিন্তু জেনে কি করব বল ?

তোর মাসীকেও ৭ দলে ফেলিস্নে পবিত্র, তোর মাসীমা  
পুরুষ নয়, নারী; তার বুক পাষণ্ড দিয়ে গড়া নয় রে;—  
তার বুক মা ছেগে আছে।”

তাহার চোখ দিয়া তুই ফোঁটা ছল গড়াইয়া পবিত্রের  
ললাটের উপর পড়িয়া গেল। দমান বাণীর ব্যথী এক-  
জনকে পাইয়া আজ পবিত্রের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল,  
মাসীমার স্নেহময় কোলে ছোটবেলার মতই মুখখানা  
লুকাইয়া রুদ্ধ কর্তে সে ডাকিল “মাসীমা—”

চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া উমা বলিলেন “তুই  
তো প্রায়ই কলকাতার বাওয়া আসা করিস পবিত্র—”

মুখ তুলিয়া পবিত্র বলিল “তাতে কি মাসীমা ?

মাসিমার মনের কথা স্পষ্ট সে জানিতে পারিল।

চাপা সুরে মাসীমা বলিলেন “একবার সেখানে যাস  
বাবা। আহা! বড় ব্যথা বুক দিয়ে তারা দুজন বিদায়  
নিয়েছে, তাদের সে ব্যথা অনুভব করার শক্তি কারও  
নেই। সমাজ অবহেলে নিতের কর্তব্য পালন করে গেল,  
সে বাজি যারা বুক পেতে নিলে, তাদের পানে একবার  
ফিরেও চাইলে না। সমাজ নিষ্ঠুর; তোরা বাপ তার  
বেশী নিষ্ঠুর, তা বলে তুইও কি নিষ্ঠুর হবি পবিত্র? তোরা  
নিষ্ঠুর হলে চলবে না তো বাপ, সে যে তোরা বিবাহিতা

স্ত্রী। যে ধর্ম-তাগের ভয়ে তোর বাপ তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে, সেই ধর্মকেই সাক্ষী রেখে যে তাকে তুই গ্রহণ করেছিস, অমন করে তাড়িয়ে দেওয়া তোর তো মানাবে না। তার কলঙ্ক তোকেই যে ঢাকতে হবে রে, তাকে আড়াল করে তোকেই যে সবার সামনে বের হতে হবে। স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা তো উড়িয়ে দেবার নয়, হিন্দু শাস্ত্র স্বামী স্ত্রী সঙ্কে কি বলেছে সেটা জানিস কি? না বাবা, তোকে যেতে হবে, তোকে তাদের বুঝাতে হবে! যদিও সে এখানে আসবার অধিকার না পায় তবু—ও”

“মাপ কর মাসীমা, আমি যেতে পারব না।”

বিস্মিতা মাসীমা বলিলেন, “কেন, তোর লজ্জা হবে? তাতে লজ্জা কি বাবা, এতে তোর দোষ কি? সত্যিই তুই জানতিস্ নে কার মেয়ে, না স্নেহে বিয়ে করেছিস। তার পর তোর বাবা-সমাজ জানতে পেরে, যে দণ্ড অর্পণ করেছে, তাতে তোর কি অপরাধ পবিত্র? আমি বলছি এতে কোনও লজ্জা নেই তোর, তুই যা একবার। আহা, তাদের মুখখানা একবার মনে কররে। দেখ দেখি বুকে কি যন্ত্রণা সহিছিস, তবু যেতে পারবি নে?”

দৃঢ় অথচ শাস্ত্র সুরে পবিত্র বলিল “না মাসীমা, তবুও

যেতে পারব না। আমি সমাজ মানিনে, ধর্ম মানিনে, কেবল মানি বাবাকে। বাবার আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারব না মাসীমা, বাবাকে আমি আর অপদস্থ করতে পারব না। মাসীমা সচি বাবাকে ততটা হৃদয়হীন ভেব না, বাবার যা জ্ঞান আছে, আর কারও তা নেই বলেই আমার ধারণা। সেই নিনটার কথা একবার মনে কর দেখি মাসীমা, সমাজের লোক আমাদের বাড়ী, তার মাঝখানে যখন প্রকাশ হল আমি পতিতার মেয়েকে বিয়ে করে এনেছি, তখন বাবার উঁচু মাথা কি রকম মুড়িয়ে পড়ল। মাসীমা, বাবা আমার সে দোষ ধরলেন না, ধরতে পারলেন না, সেই কুলকলক ছেলে আমি, আমারই ছদ্ম অদর্শনে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। না মাসীমা, আমি আমার এমন বাপের আদেশ কখনই অমান্য করতে পারব না, আমি সেখানে কিছুতেই যেতে পারব না, আমি এমনি ভাবেই থাকব। তাদের অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, সে কষ্ট ভোগ করেছে, আজীবন কাল কর্ত্তেও ; আমার অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, ভোগ করেছি, ভোগ করবার স্ত্রে প্রস্তুতও আছি। আমার সমাজ যাক, ধর্ম যাক, বিবাহিতা স্ত্রী যাক, আমার বাবার যোগ্য ছেলে হবার আশীর্বাদ শুধু কর।”

“পবিত্র—”

উমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। পবিত্রের মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

“তাই যদি হয়, তবে তাই আশীর্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করছি তাই।”

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিলেন “কিন্তু আমি যে থাকতে পারাচি নে পবিত্র, আমি বউমাকে লুকিয়ে এক-খানা পত্র দেব কি? তোর কর্তব্য তুই পালন করে যা, আমার কর্তব্য কি এই-ই নয়? আচ্ছা, তোর ক্ষেত্রে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।”

পবিত্র শুষ্ক মুখে বলিল “না মর্দীয়া, তোমারও পত্র দেওয়া উচিত নয়। বাবা যদি বলেন দিতে পার, কিন্তু বাবাকে না জানিয়ে পত্র দিলে বাবাকে অপমানিতই করা হবে মাত্র।”

“তবে থাক” -

আর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উমা কার্যোদ্দেশে উঠিয়া গেলেন, পবিত্রও বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে তখন রীতিমত একটা সভা বসিয়া গিয়াছে। আজ ভবশঙ্করের মুখে হাসি ধরিতেছে না। সচরাচর তাঁহার মুখে হাসি বড় কমই দেখা যায়, আজ হৃদয়ের আনন্দ মুখে উছলাইয়া উঠিতেছে। টোলার পণ্ডিত

শিরোমণি মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া তখন তিনি বসিতে-  
 ‘ছিলেন, ‘বুঝেছেন, শি রামণি মশাই, আজকার দিনে  
 রামময়ের দেখা নেই। আর মাস কত আগে সেই দিনটার  
 কথা মনে করুন দেখি একবার। বাস্তবিক আমি সেদিন  
 মোটে ভাবিনি, রামময় আমার বাড়ী আসবে। আপনারা  
 তো বরাবরই দেখে আসছেন, সে কখনও আমার বাড়ীর  
 ছায়া মাড়ায় না, চঠাং সে সেদিন এসে হাজির। উদ্দেশ্য  
 তার আমার লাঞ্চিত, অপমানিত করা কি না, তাই এসে  
 সভায় সেদিন মহাভারত গেয়ে গেল। আজকার দিনে  
 তার খোঁজ নেন দেখি? আজ যে গী স্তম্ভ লোক এসে  
 খেটে গেল, আমার পবিত্র এম-এ পাশ করেছে, আজ  
 কি সে এ দিক মুখো হবে?”

শিরোমণি মহাশয় একটি পনশ্রু লইয়া মুখখানা বিকৃত  
 করিয়া বলিলেন “আরে রামোঃ, তার কথা আর বলবেন  
 না। অমন লোক যদি ছনিয়ার আর একটা দেখা যায়।  
 বুঝেছেন—নিজের ঘরে কত অশোচার ব্যাভিচারিতা না  
 চলে যাচ্ছে, তাতে কোনও দোষ ‘নেই, দোষ হল আপনার  
 বেলাতেই।”

মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “কিন্তু  
 এটা তো ভাব্য উচিত, আমরা জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছি

কি না ? এতো মশাই জানা কথা, আমি এ বিষের কিছুই জানিনে। আমার একটীমাত্র ছেলে, তার বিয়ে সে কি বড় মুখের কথা ? বিষের কথা জানতে পারলে আমিই যে পঞ্চাশ খানা গাঁয়ের লোক তখনি এক করতুম। আমায় না বলে—ছেলে মানুষ, থেয়ালের বশে একটা কাজ করে ফেলেছে, তার জন্তে রামমন্ডের এতটা করা উচিত হয় নি। আমায় যদি আগে একটবার চুপি চুপি জানাত—যদি অত হুতুতারই দরকার ছিল তার, সেইটেই না সব চেয়ে ভাল কাজ হতো, দেশে দেশে এ কলঙ্কের বার্তা ভেসে যেত না। বুঝেছেন শিরোমণি মশাই, এ হচ্ছে কেবল শত্রুতা, শত্রুতা করবার জন্তেই সে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাছা আমায় সমাজচ্যুত করবেন ! এমন কি ক্ষমতা আছে তার ? আমি নিজে হচ্ছি সমাজের মাথা। আমার ছেলে না জেনে না শুনে বৈশ্যাকৃত্যকে বিয়ে করে এনেছে বলে আমিও যেতাকে গ্রহণ করব, এমন কথা কিছুতেই হতে পারে না। এই যে জানতে পারবামাত্র সেটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম, আর একটা রাত পর্যন্ত আমার বাড়ীতে থাকতে দিলুম না। বলি ভয়টা বেশী তার না আমার ? আমারই জাতিপাত হবে, ধর্মপাত হবে, তার তো কিছুই হবে না।”

শিরোমাণ ঘাড় কাত করিয়া সোলাসে বলিয়া উঠলেন “ঠিক কথা বলেছেন ; সত্য কথা বলেছেন । তা আর বলবেন না, আপনি কি যে সে লোক ? কথাতের আছে— যে যেমন তার সহিতে সক্ষম, ভগবান তার ঘাড়ে তেমনি তার দেন, তার সাক্ষী আপনিই । তার সহবার মত ক্ষমতা আপনার আছে বলে আপনার ঘাড়ে এতবড় একটা জমিদারী, এত বড় একটা সমাজ । সমাজের উচ্চ আশ্রয় আপনি । সেদিন পতিতার মেরেকে ত্যাগ করে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তাতে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে । সবাই বলছে, সমাজে এমন লোক আর হবে না । রামময় বাবু দেখেছেন ভগবান আপনার অহুকুল, কেন না আপনাকে লাক্ষিত সমাজচ্যুত করবার জন্যে তিনি অত লোকের সামনে কথাটা পাড়লেন, কিন্তু ফল হল সম্পূর্ণ উন্টো, দেশে আপনার নামে জয় জয়কার পড়ে গেল । ব্যাপার শুভ্রতর দেখে তিনি এখন পেছিয়ে গেছেন, তাইতে বড় একটা লোকের সামনে বারও হন না ।”

অতিরিক্ত প্রশংসাবাদে ক্ষীণ হইয়া ভবশঙ্কর তামাক টানিতে লাগিলেন । পবিত্র দূর হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল ।



২.

বুকের সে বেদনা তা সারেন না। হয়তো ছটারদিন ভাল যায়, এক এক দিন বুকে কি রকম ব্যথা ধরে, বৃদ্ধ জলধর অসীম দুঃখায় নীল হইয়া যান, তথাপি পাছে পূরবী ভয় পায় তাই মুখ দুটিয়া কিছুই বলেন না।

কিন্তু তিন না বলিলেও পূরবী তাই বুদ্ধিত। নিজের বেদনা সে ভুলিয়া গেল ইচ্ছা করিয়া, এত দিন তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া সে ডাক্তার ডাকল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন, গিম্ব মুখে বলিলেন “হৃৎপণ্ডের ব্যারাম হয়েছে, খুব সাবধানে রাখা দরকার। একটু বেশী রকম ধাক্কা খেলে হার্ট ফেলও করতে পারে।”

ব্যাকুল ভাবে দাদামহাশয়ের বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধ কণ্ঠে পূরবী ডাকিল “দাছ—”

তাহার মনে সঙ্গে-সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, আর বুদ্ধি সে দাছ বলিয়া ডাকিতে পারিবে না, তাহার এ ডাকও বুদ্ধি চিরকালের মত ফুরাইয়া যায়। জগতে আসিয়া সে একটা মাত্র স্নেহপূর্ণ ছবির পাইয়াছে, সে ছবিরও বুদ্ধি ছাড়া হয়। চির অভাগিনী সে, মা বলিয়া সে ডাকিতে পারা নাই, মা নাম মুখে আনিতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া যায়, দাদামহাশয়কে ডাকিয়া সে একাধারে সব নামে ডাকারই সার্থকতা লাভ

করিত। তাহার অদ্ভুতবেশে বুঝি তাহার দাহও যান।  
অভাগিনী ঈর্ষাৎ উজ্জ্বলিত হইয়া কানিয়া উঠিল, আবার  
ডাকিল “দাদামশাই।”

“আঃ পাগলী, চেপে জল ? কেন, বল দেখি ? ডাক্তার  
বলে গেছে আমার হাট ডিক্সি হয়েছে, কোন সময়ে হাট  
ফেল করবে, তাই বুঝি ? আরে—ও সব নিছাঁক মিথ্যা  
কথা, তা বুঝি বুঝতে পারছিন নে ? ডাক্তাররা অমনি  
শাড়িয়ে বলে, রোগ না হলেও বটে। রোগ হয়েছে ; সামান্য  
একটু সন্দি আর হলে লবে ব্রাকাইটিস, মচকিয়ে বুকে পিঠে  
ব্যথা হলে বলবে নিউমোনিয়া। ছেলে মামুষু তুই, ওদের  
চালাকি বুঝবি কি করে ? ওদের মতলব কি তা জানিস ?  
যাতে তাকে বেশী কল দেওয়া হয়, কারণ, টাকা বেশী  
পাবে। আমি তোকে এই জুড়ই বারণ করেছিলুম না—  
ডাক্তার আনিস নে অনর্থক উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলবি ?  
দেখ, বুড়ার কথা সত্যি হয় কি না ?”

কিন্তু এ কথার পূরণী ভুলিল না, সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে  
বলিল “না দাদামশাই, তোমার চেহারাও বড্ড খারাপ  
হয়ে গেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছে না—তাই—”

দাদামশাইর তাহাকে তাড়াইয়া গেলেন, মুখ বিকৃত  
করিয়া বলিলেন “আমার শরীরের অবস্থা আমি বুঝব না

তো বুঝবে কি ওই ডাক্তারটা ? একটা নল বুকে গিটে বসালেহ সে আমার চেয়ে বেশী জেনে গেল আর কি ? যা যা তোর কাজ কর গে যা, বিড়ালটাকে খাওয়া গে রান্নাঘরে । ক খুটখুট করে নড়ছে, হয় তো সে পোড়ারমুখী গিয়ে পেটের জালায় দুধ চুরি করে থাকছে । খাবে নাঃ বা কেন ? তুই তো তাকে পেট ভরে খেতে দিবি নে, কাজেই তাকে চুরি করে খেতে হয় । সত্যি যদি খায়, তা হলোকল্প কখুনো বলতে পারবি নে বিড়ালে মাছ খেয়েছে, দুধ খেয়েছে ।”

পুরবী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, “না, কিছু খেতে পারবে না দাদামশাই, সব ভাল করে ঢাকা আছে । কিন্তু দাদামশাই—”

“আবার দাদামশাই ? নাঃ, এমনি করে বিরক্ত করে যদি মারিস—তবে আমি আর বাঁচব নয়দিন বল দেখি ? তুই এমনি করেই তো আমায় খাচ্ছিস । নে, কাজ না থাকে ওই বইখানা নে দেখি, কাল বিকালে লাইব্রেরী হতে তোর পড়ার কণ্ঠে এনেছিলুম ; তা তুই যা মুখ ভার করে থাকিস, আমার মোটে সাহস হয় না তোর কাছে দিতে ।”

পুরবী বইখানা লহরী আসিয়া বসিল, স্নেহের স্বরে বলল “না দাদু, আর আমি কখনো তোমার অবাধ্য হব

দুঃখী আবার তেমনি হব; তেমনি আমরা দুজনে খেলা করব, বই পড়ব, তুমি ভাল করে ঐ দাদামণি।”

বিরক্ত বুদ্ধ বলিলেন “আবার ওই কথা, আমার কি হয়েছে বল দেখি? তুই বড় বেশী বাড়িয়ে তুলেছিস পূরবী, ও রকম করলে আমি আর কখনো তোর সঙ্গে কথা বলব না।”

“না না দাদামশাই, আর কখনো ও সব কথা মুখে আনব না, আর বলব না।”

পূরবী নিজের বেদনা ভুলিয়া দাদামশায়ের বেদনা দূর করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। বাহ্যিক তীহার অন্তর্মাত্র কষ্ট না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিল। যে হাসিকে সে বিদায় দিয়াছিল, সেই হাসিকে সে আবার ফিরাইয়া আনিল, আবার তেমনি খেলিতে পড়িতে লাগিল।

পূরবী তাঁহাকে এক একদিন ছাদে লইয়া গিয়া বসিল। সে দিনে সন্ধ্যার সময় দাদামশায়কে ছাদে বসাইয়া তীহার প্রিয় সেতারটি তাঁহার হাতে দিয়া, বাজাইবার জন্য দৃঢ় অনুরোধ করিয়া বসিল।

বহুকাল তিনি সেতার বাজানো বন্ধ করিয়াছেন, পূরবীর বিবাহের পর এই দুই বৎসর তিনি সেতারে হাত দেন নাই। মাকড়সার জালে ও ধূলায় সন্ধ্যা আবৃত

করিয়া সেতারটা দেওয়াগেই ঝুলিতেছিল, বহুকাল পরে আজ সে আবার জলধরের হাতে পড়িল।

কিন্তু সুর যে ঝঙ্কারিয়া উঠে না। যে সুরে সে গান গাহিত, আনন্দের সে সুর যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন “কি করতে আর সেতার দিলি দিদি, এতে যে কোন সুরই উঠাতে পারছি নে।”

ধরা ধরা কণ্ঠে পূরবী বলিল “পারবে দাদা, পারবে। চইটী বছরে সুর বেগুরে চলে গেছে, একটু চেষ্টা কর, এখনি সে সুর মিলে যাবে দাদামশাই।”

সেতারে সুর উঠিল, কিন্তু এ তো সে সুর নয়। যে সুরের তালে তালে আনন্দে হৃদয়ের রক্ত উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া উঠিত, সে সুর কোথায় গেল? এ যে কাদনভরা সুর, বেদনাভরা গান, আহা হা, সে আনন্দ কই রে, সে দিন কই?

সুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল; পূরবী গোপনে চোখ মুছিল।

“দাদা, এ কি সুর এনে ফেললে সেতারে, এ যে কাদা ভরা, ব্যথায় মাথা। সে সুর তোমার কোথায় গেল দাদা?”

রুদ্ধকণ্ঠে দাদামশাই উত্তর দিলেন “হারিয়ে ফেলেছি

হুঁ, যা হারিয়ে গেছে তাকে আর খুঁজে পাচ্ছি নে।  
এ জীবনটায় একটানা লোকসানই চলেছে যে, লাভ  
কিছুতেই নেই। অদৃষ্টে লোকসান অনিবার্য বলে—  
নিজের যা সঞ্চিৎ ছিল, তাও একে একে হারিয়ে ফেলছি।  
কত লোকে হারানো জিনিস আবার খুঁজে পায়, আমি  
তা কখনও পাইনি দিদি, আর পাবার আশাও নেই।  
অনেকখানি পথ চলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন তীরে এসে  
বসে পড়েছি। এখন মনে করছি কত ছিল, কত গেছে,  
কিছু কখনও পাইনি। পাবার আশা করিনি যে, এমন  
কথা মাসেস করে এখনও আমার বলবার ক্ষমতা  
নেই।”

“কি পাবার আশা করেছিলে দাদামশাই?” পূরবীর  
কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল।

ধীর কণ্ঠে দাদামশায় বলিলেন “সব হারিয়ে আসার  
পথেও সব যে কি আশা করেছিলুম, দিদি, সে কথা বলা  
ভার। মরতে বসেও মানুষে আশা তো ছাড়ে না ভাই।  
জলে ডুবে মরছে, তবু একটা খড় পেয়েও আঁকড়ে ধরে  
বাঁচতে চায়। আর সে সব বার্থ কথা বলে কি কাজ হবে  
দিদি, কিছু ফল নেই।”

“চৌধুরী মশাই— বাড়ী আছেন কি?”

পুরবী সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল “কে তোমাকে ডাকছে দাদামশাই?”

ততাল সুরে দাদামশায় বলিলেন “কে আর ডাকবে?”

নিচের পথের উপর হইতে আবার কে ডাকিল “ফোখুরীমশাই—”

“চল দাদামশাই, তোমায় নিচে যেতে হবে। কে ভদ্রলোক ডাকছেন দেখা তো দরকার।”

দাদামশায়কে বাড়িরের ঘরে পৌছাইয়া দিয়া সে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল।

তলধর দরজা খুলিয়া দিলেন, ‘দরজায় দাঁড়াইয়া বনমালী।

কি কার্য্য বাপদেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এই সময়টায় একবার দুঃখিনী পুরবীকে দেখিয়া যাইবার প্রলোভন তিনি এড়াইতে পারেন নাই। আজই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার স্তম্ভ ভবশঙ্করের আদেশ ছিল, তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করিবেন ভাবিয়াছিলেন। মনটা তাঁহার কি রকম অপকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিল, প্রভুর আর সব আদেশ তিনি বর্ষে বর্ষে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন এ আদেশ তিনি পালন করিবেন না।

ধনীকে দেখিতে সবাই আছে, দরিদ্রের যে কেহই নাই। ধনী অনায়াসে সমাজের মাথা হইয়া দাঁড়ায়, ধরিতে গেলে সমাজকে সে নিজের ইচ্ছানুসারেই চালিত করে। দরিদ্র সেই সমাজের পেয়ণে পেষিত হইয়া নীরবে শুধু চোখের জলই ফেলিয়া যায়।

দরিদ্রের দুঃখ বনমালা বুঝিতেন, সমাজের পীড়নে পীড়িতদের বাধা তিনি বৃক দিয়া অনুভব করিতেন। তাই সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জ্ঞান, সমাজ সংসারের সহিত যুদ্ধ করিবার জ্ঞান তিনি সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হায়, নগণ্য লোক তিনি, সমাজ তাঁহার কথা কাণেই তুলে না। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অনুভব না করিয়াই হাসিয়া একেবারে উড়াইয়া দেয়। যদি কোনও একজন ধনী পৃষ্ঠপোষক তিনি পাঠিতেন, তাঁহার কথা সমাজ গুনিত, তাঁহার যুক্তিমত চলুক বা না চলুক, অন্ততঃ ভানিয়াও দেখিত বটে। প্রভু ভবশঙ্কর তাঁহার সম্পূর্ণ বিবোধী ছিলেন। পরস্পর বিপরীত পথে চলিলেও, তিনি যথার্থই প্রভুর ভক্ত ছিলেন, ভবশঙ্করের সংসারই তাঁহার আপন সংসার ছিল।

আজ এই বাতীখানার দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার মনে ভবশঙ্করের রক্ত মস্তি জাগিয়া উঠিল।



যদি কোনও ক্রমে তিনি স্তনিতে পাম বনমালী ১২নং কলুটোলার গিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি কি রক্ষা রাখিবেন ?

কিন্তু পিছাইবারও ইচ্ছা ছিল না, বাহাই হোক তিনি সহ্য করিবেন, যে দণ্ডই ভবশঙ্কর দিন না কেন। তিনি তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন।

দরজা খুলিবা মাত্র বনমালী দেখিলেন, সম্মুখে জলধর। দুই বৎসর আগে তিনি যে জলধরকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত, ইঁহার আকৃত মিলাইয়া বনমালী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দুইটা বৎসর মাথার উপর দিয়া যেন বহিয়া গিয়াছে, তাই সে সটান দীর্ঘ দেহ আর নাই, তিনি অনেকটা কাবু হইয়া পড়িয়াছেন।

“প্রণাম করি চৌধুরী মহাশয়—”

তিনি প্রণাম করিতেই জলধর অত্যন্ত সচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন, লোকটা যে কে তাহা মোটে চিনিতেই পারিলেন না।

বনমালী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “আমায় চিনতে পারছেন না বোধ হয় ? আমি ভবশঙ্কর বাবুর দেওয়ান বনমালী রায়। ছ বছর আগে নূরপুরে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, মনে করে দেখুন।”

“নূরপুর,—ভবশঙ্কর বাবুর দেওয়ান—”

জলধর চমকাইয়া উঠিলেন, কতক্ষণ তিনি কথা বলিতে পারিলেন না; নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন “আসুন, আসুন, বসুন। সত্যি আমি দিনতে পারি নি। চোখে মোটেই আর দেখতে পাইনে বনমালী বাবু, দিনবই বা কি করে? এই যে, এই তক্তাপোষে বসুন।”

বসিতে বসিতে বনমালী বলিলেন “এই দুই বছরেই আপনার চোখ এত খাশাপ হয়ে গেল চোখুরী মশাই? তখন তো বেশ দেখতে দেখেন দেখেছি।”

নৈরাশের হাসি বুকের মুখে ফুটিয়া উঠিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, “সে এক দিন গেছে বনমালী বাবু। দিন তো যাচ্ছে, সে কিরে আসছে না। দিন যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল, চোখের দৃষ্টি, দিন দিন সবই যাচ্ছে। এখন বয়েস যাচ্ছে বনমালী বাবু, বয়েস বাড়ছে না।” আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া বাতীর হইয়া গেল।

ব্যথিত বনমালী তাঁহার অঙ্গকার শোকাচ্ছন্ন মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন, নিজের অজান্তসারে কখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন তাহার ঠিক নাই।

“তার পর—সেখানে সব ভাল আছেন? পবিত্র, তার বাপ, মাসীমা—?”

বনমালী ষাড় কাত করিয়া বলিলেন “সবাই ভাল আছে।”

বৃদ্ধ আয়ত্নতোলা এক এক করিয়া কত প্রশ্ন করিয়া চলিলেন তাহার ঠিকই নাই, বনমালীও তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পবিত্রের কথা আসিয়া পড়িল—  
“বনমালীবাবু, পবিত্র আর একবারও কলকাতায় আসে নি, আজ দু বছরের মধ্যে?”

বনমালী মিথ্যা বলিতে পারিলেন না, এষ্ট সরল হৃদয় মৃত্যু-পথযাত্রী অতি বৃদ্ধের কাছে মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, তিনি বলিলেন “হ্যাঁ, সে তো প্রায়ই আসে।”

“প্রায়ই আসে—?”

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন। প্রায়ই আসে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি? বিশাল কলিকাতা সহর, ইহার মধ্যে তাঁহার ছুটিতে কোথায় এক কোণে পড়িয়া আছেন, কে তাহার খোঁজ রাখে? এখানে আসিলেই যে তাঁহাদের কাছে তাহার আসিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

তাহাদের সহিত তাহার তো সব সম্পর্কই উঠিয়া গিয়াছে, তবে সে আনিবেই বা কন ?

সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে, হায় রে, কথাটা বলা যত সহজ, কাজে যদি তাহাই হইত ! দাগ যে বুকের মাঝে একেবারে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, এ যে কিছুতেই উঠিতেছে না । চিত্ত সে অলিয়াছে, এ অগ্নি যে কিছুতেই নির্যাপিত হইতেছে না । সম্পর্ক নাই, জোর করিয়া এত কথাটা বলিলেই কি হইল, তাহাই কি সম্ভব হয় কখনও ?

কম্পিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন “বনমাণী বাবু—”

বনমাণী উত্তর দিলেন “বলুন—”

চকিতে বক্রবাটাকে চাপিয়া জলধর বলিলেন “না, বগছিলাম কি, আত্মজাতী দিনটা এখানে থেকে যাবেন তো ?”

তিনি যে কি একটা অথাভরা কথা প্রকাশ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহা চাপিয়া পেলেন, বুদ্ধিমান বনমাণী তাহা বুঝিলেন ; সে প্রসঙ্গে আর কথা না তুলিয়া তিনি বলিলেন “এসেছি যখন অবশ্যই থেকে যাব বই কি ? আমি যে আমার নির্বাসিতা মাঝে একবার দেখতে এসেছি চৌধুরী মশাই, শুধু দেখেই যাব না, আমার মায়ের হাতের রান্না পর্যন্ত খেয়ে যাব । সমাজ খায় নি, তা বলে আমার অন্ন

দিতে তিনি যেন সন্তুষ্ট না হন। ‘আমি ভবশঙ্কর নই, আমি পবিত্র নই, আমি সমাজ ছাড়া লোক। আমি নাচের ছেলে। মা যাই যেন না কেন, ছেলের কাছে তিনি চিরবন্দ্য। একবার ডাকুন আমার মাকে, আমিই তাঁকে বলছি, শীগগির করে আমায় চারটা ভাত দিতে হবে।’

লজ্জিতা কুণ্ঠিতা পূরবী কিছুকালই অগ্রসর হইতে পারিল না। নিজের কথা মনে করিয়া নিজেরই সে মরমে মরিয়া যাইতেছিল, নিজের হীনতা তাহার সন্মুখে যেন স্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

বনমালী নিজের গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, হাসি মুখে বলিলেন “তোমার তো এত কুণ্ঠা বজ্জা সাজবে না মা লক্ষ্মী? ছেলেকেই যদি নাজা করে চলবে তুমি, তা হলে অসন্তুষ্টতা তুমি লাভ করবে কোথায়? এরকম করলেই চলবে না মা, বেশ বুঝি এই বুড়োকে তাড়ানব কোশল তোমার। ‘কিন্তু বুড়ো ছেলে তোমার বড় নাছোড় বান্ধা মা; সে মায়ের আঁচল কিছুতেই ছাড়বে না। তোমার ভাত রাঁধতেই হবে, আমার কোল ভাত দিতেই হবে। না থাইয়েই যে তাড়াবে সে হতে পাবে না।’

পূরবী নত মুখে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “আমার হাতের ভাত আপনি খাবেন কাকা?”

তাহার কার্কা সম্বোধনে অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিয়া বনমালী বলিয়া উঠিলেন “খাব না, আলবৎ খাব। ৩মি একবার ভাত দিয়ে দেখ না মা, হাঁড়ি আজ তোমার কাবার করে ছাড়ব। পেটে আমার কি থিদে তা মা হয়ে জানতে পারছ না মা?”

“কিন্তু আমি যে পতিতার মেয়ে কাঁকা—”

রুক্ষকণ্ঠে বনমালী বলিয়া উঠিলেন “আবার সেই পচা পুরানো কথা, শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। এ জগতে পতিতই বা কে আর মহৎই বা কে মা? পতিত মহৎ এক জায়গা হতে এসেছে, এক জায়গায় যাবে, কার্গাকালে সেখানেই তার বিচার হবে, সে জন্তে আমাদের তো এতটা মাথা ঘমানোর কোনও দরকার দেখছি নে। তোমার আমরা পেয়েছি, তোমার পতিতা মাকে তো পাইনি যে, তার পাপ ওজন করে দেখতে যাব। মায়ের বাপের পাপে সম্মান যদি স্থগিত হয়, তাকে যদি দণ্ড দেওয়া হয়, দণ্ডনাতার জন্তেই যে অনেক দণ্ড তোলা থাকবে মা, পরিণামে সে দণ্ড তো কেউ রদ করতে পারবে না।”

অশ্রুসজ্জল নেত্রে পূরবী নত হইয়া বনমালীর পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে

কখন সে গোপনে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছিল, দেখা  
সংবত শুককণ্ঠে সে বলিল “বহুন কাকা, আমি ভাত বসিয়ে  
দিয়ে আসি।”

“শীগগির কিন্তু মা, বড় খিদে পেয়েছে—।”

প্রসন্নমনে পুরবী চলিয়া গেল।

সোববাহটা যে বিবাহই নয়, ভবশঙ্কর তাহা সম্মান  
করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। কাটালপাড়ার  
বন্ধিষু জমিদার বাবুর একমাত্র সুন্দরী মেয়ের সহিত পুনর্বার  
পবিত্রের বিবাহ দিবার জ্ঞা তিনি এবার নামিয়া পড়িলেন।

পবিত্রের মুখ শুকাইয়া গেল, আবার বিবাহ? তাহার  
ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে।

অসহায়ের সহায় মাসীমাকে সে গিয়া ধরিল “তোমাকেই  
এর একটা উপায় করতে হবে মাসীমা, নইলে চলবে না।

মাসীমা বলিলেন “আমি কি করব বাবা?”

“বিয়েটা যেমন করেই হোক বন্ধ রাখতে হবে।”

ইদানিং পবিত্র পুস্কের স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়াছিল।  
আগেকার মতই সর্বদা হাসিত, পড়াশুনা করিত, মাসীমার  
কাছে সাহায্য করিতে আসিয়া অনভ্যস্ত হস্তে একটা

কারিতে গিয়া আর ঐকটা করিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাসিত। সে যে এখনও সেই কয়টা বৎসর পূর্বের স্মৃতিখানা মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, উমা তাহা জানিতেন না। শেষ কালটায় পবিত্রের ছেলেমানুষী ভাবটা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল বলিয়া তিনিও সকলের মত ভুল বুঝিয়াছিলেন।

বিস্মিত ভাবে তিনি পবিত্রের পানে চাহিলেন, পবিত্র অপ্রতিভভাবে অতৃদিকে মুখ ফিরাইল।

উমা বলিলেন “বিয়ে করবিনে, সে প্রতিজ্ঞা এখন তুই অটুট রাখতে চাস্ পবিত্র?”

পবিত্র অতৃদিকে মুখ রাখিয়াই উত্তর দিল “হ্যাঁ মাসীমা। আমার বিয়ে তো হয়েছে, আবার বিয়ে করা পাণের কাজ নয় কি?”

“কিন্তু সে ত্রীকে তুই আর গ্রহণ করতে পারবিনে তো পবিত্র, নিজের মুখেও তো বলি'ছস্।”

পবিত্র অন্তরে দৃষ্টিলাভ করিয়া পূর্ববীর স্মৃতিখানা একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর বলিল, “সত্যি সে কথা, আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব না। কিন্তু তবুও মাসীমা, আমি আর বিয়ে করতে পারব না, তুমি একবার বাবাকে কোনও রকমে এ কথাটা বললে—”



উমা শিহরিয়া বলিলেন “তুই কেপেঁছিস পবিত্র, আমি দাদামণিকে এই কথা বলতে যা। তঁার সামনে আমি মোটে কথাই বলতে পারিনে। এ কথা বলব কি করে ?”

পবিত্র ছাড়িল না, বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই ধরিয় বসিল, “পারব না বললে চলবে না মাসীমা, তোমাকেই এ কাজ করতে হবে, তুমি ছাড়া আর কেউই পারবে না। আমি বলতে পারতুম মাসীমা, কিন্তু ভেবে দেখলুম, আমার বলা উচিত নয়, বাবাকে দেটা স্পষ্ট ঝেড়ে ফেলা হয়। বাবার আত্মাতিমানে একটা দারুণ আঘাত লাগবে, যে আমি নিজে তাঁর মুখের উপরে অবাব দিয়ে দিলুম মাসীমা—”

এমন আত্মত্যাগে সে মাসীমা বলিয়া ডাকিল যে, মাসীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তাই হবে রে, তাই বলব। আমিই না হয় কথাটা ভুলে দেব কাণে। তিনি আমার তার পর যাই বলুন। তোকে আমি স্পষ্টতঃ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেব না, তাঁর সে রাগের ঝড়টা আমার ওপরেই প্রথমটা এসে পড়ুক, আমার দ্বারা প্রতিহত হয়ে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের বেশী থাকুক দিতে পারবে না। আচ্ছা মা, আমি বলব এখন, তার অন্তে প্রস্তুত হয়ে থাক গিয়ে।”

সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তঃপুরে ভবশঙ্করের পদার্পণ হইত একটীয়ার মাত্র, আহারের সময়। উমা ভাবিয়া রাখিলেন, সেই সময় কথাটা তুলি যাইবে।

কিন্তু ভবশঙ্করের শস্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়াই তাঁহার বক্তব্য তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার এতখানি ব্যস হইয়াছে, আজ্ঞে চোটবেলার মত তিনি সহসা ভবশঙ্করের সম্মুখে বাহির হইতে পারিতেন না, কোন কথা বিজ্ঞানা করিতে গেলে কণ্ঠ ড়াইয়া আসিত।

কিন্তু না বলিলেও যেনই, পবিত্রের কাছে তিনি যে স্বীকার করিয়া আনিয়াছেন।

বলি বলি করিতে করিতে ভবশঙ্করের আহার শেষ হইয়া গেল, তিনি গভুঘ করিলেন।

আর চুপচাপ থাকা সম্ভব নয়। ভবশঙ্কর এখনই গিয়া শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার বন্ধ করিবেন, ঘণ্টা থানেক বিশ্রাম করিয়া আবার বাহিরে যাইবেন।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ডাকিলেন “দাদা-মলি—একটা কথা—”

ভবশঙ্কর বলিলেন “কি বলছ উমা?”

উমা ধীরে ধীরে বলিলেন “পবিত্রের ইচ্ছে—”

অসুস্থ করিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “কি পবিত্রের

ইচ্ছে ? যা বলবে যাঁ করে বলে ফেল, আমি আর বসতে পারছি নি।”

তাঁহার কুঞ্চিত জগুত গম্ভীর মুখ, ততোধিক গম্ভীর কথা শুনিয়াই উমার বকের মতো ধড়াস ধড়াস করিতেছিল, অতি কষ্টে তিনি বলিয়া ফেলিলেন “পবিত্রের ইচ্ছা নয় যে, সে এ বিয়ে করে, সে আমার তাই—”

“বস করো” গর্জিয়া উঠিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “বলতে চাও, তার ইচ্ছে সেই পতিতা-কন্যাকে নিয়ে এসে সংসার পাতবে, আমার পবিত্র ভিটে কলঙ্কিত করবে ?”

কাঁপিয়া উঠিয়া উমা বলিলেন “না, সে সে কথাও বলছে না। সে সে স্ত্রীকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু এ বিয়েও করবার তার মত নেই।”

ভবশঙ্কর হাসিলেন, তখনই মুখের সে কর্কশ হাসি মিলাইয়া গেল—“আশ্চর্য্য কথা উমা, তার মতলব আমি বেশ বুঝেছি। সে বিয়ে করবে না, তার মূল উদ্দেশ্য সে সেই বেপ্তাকন্যাকেই চায়। আমার বংশের কলঙ্ক হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে এ স্পর্ধা তার কখনই মাজবে না।”

তাঁহার স্বর অত্যন্ত কঠিন।

“আচ্ছা, তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও গিয়ে, আমি উপরের ঘরে চললুম।”

অসংখ্য পদে খট খট খড়মের শব্দ করিতে করিতে তিনি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

তিনি তো গেলেন, কিন্তু পবিত্র যার কি করিয়া? পিতা যে কঠোর বিচারক, বার বার তাহার অপরাধ তো তিনি মার্জনা করিবেন না। দুইবার গুরুতর অপরাধ করিয়া সে মার্জনা পাইয়াছে, এবারে তাহার দণ্ড নিশ্চিত। সে দণ্ডের কথা ভাবিয়া পবিত্র ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু ওই যে “পবিত্র” আহ্বান—সাধ্য কি তাঁহার, চূপ করিয়া থাকে সে? তাহাকে যাইতেই হইবে যে, লুকাইয়া থাকার ক্ষমতা থাকিয়াও যে নাই। চুষক যেমন লোহকে আকর্ষণ করিয়া আনে, ভবশব্দ্যের আহ্বানও তেমনি সকলকে আকর্ষণ করিয়া কাছে আনিয়া ফেলে।

পায়ে পায়ে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইল, সেই দরজাটির কাছে আসিয়াই সে থামিয়া গেল।

কর্কশ কণ্ঠে পিতা ডাকিলেন .“এ দিকে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?”

পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

“তোমার মাসীমাকে তুমি যে কথা বলেছ, তা শুনলুম। তোমার উদ্দেশ্য কি, আমি তা শুনতে চাই।”

পবিত্র নীরব।

অস্ত্রের ক্রোধরূপ বহু পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, বুদ্ধিমান ভবশঙ্কর তাহাকে দমন করিয়া শাস্ত কণ্ঠে বলিলেন “তোমার ইচ্ছা বেষ্ঠাকন্যাকে আবার এ ঘরে ফিরিয়ে আনা?”

পবিত্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল “না বাবা, আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনার অনুমতি না পেলে আমি তার মুখ দেখব না। আমি আপনার ছেলে বাবা, আমার কথা, আমার প্রতিজ্ঞা অটল।”

একটু খুসি হইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “হ্যাঁ, সে প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে, কখনও যেন ভুল না হয়। আমার পবিত্র ভিটে বেষ্ঠাকন্যার পদস্পর্শে কলঙ্কিত হ'য়েছিল, যদিও সে ঠাকুর পূজার যোগাড় করেনি তবু সে সে ঘরে প্রবেশ লাভ করেছিল, এর জন্ত আমায় রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। আবার সেই বেষ্ঠাকন্যা আমার ভিটের পা দিবে—কখনও তা হতে পারবে না।”

পবিত্র নত মুখে বসিয়া রহিল।

তামাক টানিতে টানিতে ভবশঙ্কর বলিলেন “তার পর বিয়ে করতে নারাজ কেন, গুনি?”

পবিত্র নীরব।

নলটা মুখ হইতে সরাইয়া ভবশঙ্কর বলিলেন “চুপ করে

রইলে যে? একটাকোনও কারণ আছে তো যার জন্যে তুমি বিয়ে করতে চাও না। সে কারণটা আমার বুঝিয়ে বলে দাও, তবে তো বুঝব।”

ধীর স্বরে পবিত্র বাণেশ “কারণ কিছু নেই।”

“কিছু নেই?”

ভবশঙ্কর বিস্মিত ও রাগত হইয়া উঠিয়াছিলেন, রূঢ় দৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া বাণেশ “কারণ কিছু নেই, এ কথা বলে বুঝাতে পারো উমাকে, তার চোখে দুগো তুমি সহজেই দিতে পারো, আমার পার না তা জানো? আমি কিন্তু সহজেই তোমার ছেড়ে দিব না পবিত্র, এর কারণ আমি নিশ্চয়ই শুনব, তবে তে’মায় ছাড়ব।”

উচ্ছ্বসিত হইয়া পবিত্র বলিয়া উঠিল “সত্যি কথা বলছি বাবা, কারণ আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি নে। আমার ক্ষমা করুন বাবা, এগারের মতন আমার ছেড়ে দিন, আমি বিয়ে করব না, করতে পারব না। আপনি যদি তাদের কিছু না বলতে পারেন, আমার আদেশ দিন, আমি নিজে গিয়ে তাঁদের বলে আসছি এ বিয়ে হবে না। সব দোষ আমি আমার ঘাড়েই নিচ্ছি বাবা।”

ভবশঙ্কর গর্জিয়া বলিলেন “কিন্তু—যত দিন আমি বেঁচে থাকব, তুমি অপকর্ম করলে কথা শুনতে হবে আমাকেই,

আর তোমার কাজের ফল আমার ভোগও করতে হবে। শোন পবিত্র, বার বার আমার তুমি লোকের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত করে এসেছ। এবারেও ব্যাপারটাকে তুমি যত ছোট বলে মনে করছ, সত্যি এটা তত ছোট নয়। দেশে দেশে এ বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, আজ বিকেল হতে আত্মীয়েরা আসতে আরম্ভ করবেন খবর পেয়েছি। আর পাঁচদিন মাত্র থাকি আছে বিয়ের। এখন এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে যাওয়া যে কতদূর নিৰ্কুদ্রিতার কাজ, সেটা যে তোমার মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলেকে আমার বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে, এইটাই বড় দুঃখের কথা। দেখ, ছেলে মানুষি সব সময়ে সকল জায়গায় খাটে না, মাথা ঠিক করে কাজ করতে হয়। বেষ্ঠাকন্ডা তোমার জ্ঞী হতে পারে না, তোমার যথার্থ জ্ঞী হবার অধিকার আছে এই মেয়েটির। যাও, বেশী ছেলে মানুষি করো না, বয়েস হয়েছে একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করতে শেখ। তোমায় এ বিয়ে করতেই হবে, এই আমার মোট কথা। ও সব উড়ো ভাবনা ঝেড়ে ফেলে যথার্থ ভাবনা ভাব গিয়ে।”

পবিত্র কি বলিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাই তেমনই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাছে আবার সে কোনও কথা বলিয়া বসে তাই ভবশঙ্কর

গড়গড়া সরাইয়া 'রাখিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিলেন  
 “যাও যাও, বড় ঘুম আসছে, আর বসতে পারহিনে। কই  
 উঠলে পবিত্র ?”

একরূপ প্রায় জোর করিয়া পবিত্রকে উঠাইয়া দিয়া  
 তিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাহিরে আসিয়াই পবিত্রের একটা কথা মনে পড়িয়া  
 গেল, দরজায় আঘাত করিয়া সে ডাকিল “বাবা—?” .

“এখন যা বাপু, একটু ঘুমিয়ে উঠি, তার পরে যা বলার  
 থাকে, বলিস।”

অগত্যা ভয়মনে পবিত্র ফিরিল।



কিছুতেই না, ভবশঙ্করের কথা কিছুতেই নড়চড় হইবে না। এ কি যে সে লোক—যে কথা মত কার্যা করিবে না ? ভবশঙ্করের যে কথা সেই কাজ।

বাড়ীতে বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। বড় জাঁকের বিয়ে, গ্রামে একটা সোরগোল উঠিল। আত্মীয় আত্মীয়াতে বাড়ী ভরিয়া উঠিল।

পবিত্রের মলিন শুষ্ক মুখখানার পানে চাহিয়া উমা কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলই বা, ভবশঙ্করের কঠিন আদেশ পালন করিয়া যাইতেই হইবে, ভবশঙ্করের কথার উপরে কথা বলে এমন ক্ষমতা কাহার ?

পবিত্রের মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া বনমালী সাহসে ভর করিয়া একবার ভবশঙ্করের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন, মাথা চুলকাইয়া খানিকটা অঁা উঁ করিয়া শেষে বলিলেন “বাবু, একবার পবিত্রের মুখের পানে তাকিয়ে দেখে তার পরে কাজটা করলে হতো না কি ? পবিত্রের মনে মোটে শান্তি নেই, সে কেবল লুকিয়ে—”

ভবশঙ্কর তাঁহাকে তাড়াইয়া গেলেন, “যাও যাও, তোমাকে আর তার পক্ষ সমর্থন করতে আসতে হবে না বনমালী, নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। আমার ছেলে, আমি যা খুসি করব, তাতে কারও কথা বলতে আমার দরকার দেখছিলেন।”

তাই বটে, আজ পবিত্র তাঁহার নিজের ছেলে, কিন্তু এমন একটা দিন আসিয়াছিল, যে দিন এই দান্তিক ভবশঙ্করই বনমালীর ছথানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কককণ্ঠে বলিয়াছিলেন “পবিত্র শুধু আমার একারই না বনমালী, বরং আমার চেয়ে পবিত্র তোমাকেই জানে, চেনে—ভালগাসে—হায় রে! আজ সেই কি না বলিতেছেন, পবিত্র আর কাহারও নহে, আর কাহারও পবিত্রের সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার নাই; পবিত্র আজ তাঁহার সম্পূর্ণ একার, পবিত্রের উপর অধিকার তাঁহারই।

ধীরে ধীরে বিগত মুখে বনমালী সন্নিয়া গেলেন।

হুপুব বেলা আহাঙ্গানি সমাপ্তে বাহিরে আসিবেন, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উমা বলিলেন “দাদামণি, ছেলেটার পানে একবার চেয়ে দেখেছেন কি? সে যে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, হাসি তার মুখ হতে মিলিয়ে গেছে—”

হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন “উমা!—”

উমা একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন।

তেমনি ঝাঁঝালো স্বরে ভবশঙ্কর বলিলেন “তোমাদের মনে করে রাখা উচিত, পবিত্রের সম্বন্ধে আমি কতটা সতর্ক আছি, পবিত্র আমার কি জিনিস। আমি দেখছি তোমরা সকলেই আমায় উপদেশ দিতে আসছে, যেন পত্রিকে আমি বলি দিতে নিষে যাচ্ছি। দেখ, একটা কথা বলি শোনো, সতর্ক হয়ে কথা বলো, যা তা মুখে আসবে আব বলে যাবে, তা করো না। পবিত্রকে মাহুষ করেছ বলেই যে পবিত্র তোমার আপনার, আমার কেউ নয় এতো না। তোমাদের বাপ ছেলের মাঝখানে দাঁড়াতে আসা একেবারেই অসম্মত, এটা মনে রেখো।”

উমার মনে কথাটা বড় জোরেই গিয়া বাজিল, মনে হইল বুকখানা শতধা হইয়া যায়। হা রে নারী, তুই শুধু অপার স্নেহ ঢালিয়া মাহুষই করিয়া গিয়াছিস, নিজের সবটাই দান করিয়া বসিয়াছিস, প্রতিদান পাওয়া দূরের কথা, তোকেই যে ছাঁটিয়া ফেলা হইতেছে। কোথায় ছিলেন সেদিন ভবশঙ্কর—যেদিন পবিত্রের মা শিশু পবিত্রকে ছাদশবর্ষীয়া ভগিনীর হাতে দিয়া বড় শাস্তিতে

চক্ষু মুদিয়াছিলেন ?' বালিকী উমা সেই শিশুকে কি করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। কত বিনিদ্র রাত্রি গিয়াছে, কত দিন আহার পযাস্ত হয় নাই। পবিত্রের অস্ত্র হইলে সে ভোগটা ভোগ করিত কে ? ভগবতীর ঔষধ-পত্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থালাস, উমার অক্লান্ত সেবা,—তিনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন ? বোধ হয় নয়। যদি লক্ষ্য করিতেন, তবে আজ গেই পবিত্র উমার কেহ নয়,—এ কথাটা এমন করিয়া কি বাগতে পারিতেন ? হায় রে নারী, শুধু দিয়াই গিয়াছিস, তোর সে দেওয়া একেবারেই অসার্থক হইয়া গেল রে।

হোক, তাই হোক, ভগবান, তাই হোক। পিতা-পুত্র মিলন হোক, ইহার বেশী প্রার্থনার জিনিস আর কি থাকিতে পারে ? উমাও তো তাই চান। পবিত্রের স্ত্রী আশ্রুক, তাহার হাতে তাহার সংসার বুঝাইয়া দিয়া তিনি দুদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতরে তো কাক, চিল বসিবার যো নাই। ছেলেপুলের চ্যাঁ ভ্যাঁ, তাদের মায়েদের চীৎকার, কোথাও গল্প, কোথাও হাসি, কোথাও কান্না। পবিত্র সব ছাড়িয়া তেতাণার ছোট বগী আশ্রয় করিয়াছে। সে একেবারে নিচে আসাই প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

বিবাহের তখনও দিন তিনেক দেবী, উমা বারাণ্ডায় বসিয়া আত্মীয়াদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। পবিত্র যে মোটেই নিচে আসে না, একটীবার দেখা করে না, জনৈক মহিলা ইহাট লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। উমা তাড়াতাড়ি পবিত্রের দোষ চাকিবার জ্ঞান বলিতে ছিলেন, কি বলব দিদি, ছেলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। বলছি বাপু অমন কাণ্ড আকছার হয়ে আসছে, তোরই নতুন নয়, তবু সে বলে—না মাসীমা, আমি বেক্রতে পারব না। কি বলব ভাই, আস্ত পাগল, এত বিজ্ঞে শিখেছে, তবু যদি ছেলেমানুষি যায়।

কিশোরীর দল হাসিয়া উঠিল, বিকম্পিত প্রায় হাসিকে গোপন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে উমা বলিলেন, “সত্যি, ও অমনি পাগলা ছেলে। যেটা করতে নেই বলব, সেইটেই ঠিক করে বসবে। ওর মাকে প্রশ্রয় করতে বলব, ছেলে আমার নমস্কার করে বসবে।”

বলিতে বলিতে অনেকদিন আগেকার সস্ত্রীক পবিত্রের কথাটা মনে পড়িচ্চা গেল, তিনি হঠাৎ অগ্রমনস্ক হইয়া গেলেন।

“মাসীমা—”

পিছনে স্যকিতে তিনি কিরিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির উপর

দাঁড়াইয়া পবিত্র ! তাহার মুখখানা অত্যন্ত ভার, আর তেমনি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; বড় বড় চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক আরক্ত, যেন ফাটিয়া পড়িতে চায় ।

সম্মুখা উমা বলিয়া উঠিলেন “এই যে পবিত্র—”

কম্পিত কণ্ঠে পবিত্র বলিল “এদিকে এসো মাসীমা, কথা আছে শোনো ।”

“কি কথা বাবা—” তাড়াতাড়ি উমা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন । তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পবিত্র বলিল, “আমার ঘরে চল মাসীমা ।”

“এ কি রে পবিত্র, তোর হাতখানা এত গরম কেন ? তোর মুখখানাও যেন কি রক্ত দেখাচ্ছে ? তোর কি অর এসেছে না কি ? দেখি গাটা—”

একটু হাসিয়া তাঁহার হাতখানা সরাইয়া দিয়া পবিত্র বলিল “থাক মাসীমা, এখন গা দেখতে হবে না । চল তো আমার ঘরে, তার পর দেখো এখন । অনর্থক লোককে জানিয়ে কেবল বাস্তব করা হবে মাত্র ।”

নিজের পা তাহার স্থিরভাবে পড়িতেছিল না, তথাপি উমাকে টানিতে টানিতে তেতালায় সে ছোট ঘরখানায় লইয়া গেল । উমাকে বসাইয়া তাঁহার কোলে মাথা দিয়া তইয়া পড়িয়া অত্যন্ত শান্তভাবে সে হাঁফাইতে লাগিল ।

উমা তাহার কোর্টের বোতাম খুলিয়া গাত্ৰের তাপ পরীক্ষা করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বিবর্ণ মুখে বলিলেন “ইস্‌ গা যে তোর পুড়ে যাচ্ছে পবিত্র, এতটা জ্বর হয়েছে, এ নিয়ে তুই নিচে গিয়েছিলি আমার ডাকতে? এখান হতে কাউকে ডাকতে পাঠালেই হতো, তোর জ্বর হয়েছে শুনলে কি নিচে থাকতুম?”

শ্রান্ত পবিত্র বলিল “শুধু শুধু সকলকে ব্যস্ত করে—”  
বাধা দিয়া উমা বলিবেন, শুধু শুধু? কি ভয়ানক গরম হয়েছে তোর গা, আমার কোলে মাথা দিয়ে আছিস, কোল যেন পুড়ে যাচ্ছে।”

“একটা বালিস দাও মাসীমা, তুমি শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই হবে এখন।”

উমা সজ্জন্তে বলিয়া উঠিলেন “ষাট বাছা আমার, আমার কোল থাকতে বালিস মাথায় দিবি কেন বাবা? এই তো বেশ শুয়ে আছিস, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?”

নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া শুইয়া পবিত্র বলিল “অসুবিধে? বিলক্ষণ মাসীমা, তুমি বোধ হয় জানো না, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শোব বলেই তোমার নিজে গিয়ে ডেকে আনলুম। তিনদিন বাদে বিয়ে, আজ আমার জ্বর হয়েছে শুনে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠবে, তাই

কাউকে জানালুম না। কাল সকালেই আবার ভাল হয়ে যাব, রাত্রেই জ্বর ছেড়ে যাবে এখন, কিছু ভাবনা করো না মাসীমা।”

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মাসীমা বলিলেন “তাই” হোক বাছা, তাই হোক। দামোদর করুন, রাত্রে মধ্যাহ্নে তোর জ্বরটা ছেড়ে যায়, কাল সওয়া পাঁচ আনার হরির লুট দিই আমি।”

বড় শাস্তিময় কোল এ;—পবিত্র নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া রহিল।

জরের প্রবল বাতনা। অনেককাল পরে তাহার জ্বর হইয়াছে, চার পাঁচ বৎসর প্রায় জ্বর হয় নাই। জরের যন্ত্রণায় যতই সে ছটফট করিতেছিল, উমা ততই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি ঠিক জানিতেছিলেন, দারুণ মনো-কষ্টেই পবিত্র শরীরকে অবহেলা করিয়াছে, তাহার ফলেই এই জ্বর হইয়াছে। এখন তাঁলয় ভালয় জ্বরটা ছাড়িয়া গেলে যে বাঁচা যায়, আর তিন দিন পরে যে বিবাহ।

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে পবিত্রের ঘুম আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে সে পূরবী—পূরবী করিয়া চোঁচাইয়া উঠিল।

হায় রে অভাগা—



উমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ধন্ত রে তুই পতিতা-কন্তা, সার্থক তোঁর জীবন গ্রহণ। একজনের অকুরন্ত ভালবাসা কি নিবিড় ভাবে তোকে বেঁধন করিয়া আছে, ধন্ত তোঁর নারীজন্ম। জগতে সকলেই তোকে ঘৃণা করিয়াছে, সকলে তোকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু যে তোকে বরণ করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এখনও পূর্ণ-রূপে জাগিয়া আছিস তুই।

“পবিত্র—বাবা—”

চৈচাইয়া উঠিয়াই পবিত্রের তন্দ্রা দূর হইয়া গিয়াছিল, অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে নিদ্রিতের ভাবে পড়িয়া ছিল।

তাহার এ ছলনাটুকু স্নেহময়ী মাসীমা সহজেই ধরিতে পারিলেন। তাহাকে লজ্জিত করিয়া তোলা তাঁহার উচিত নয় জানিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন, আর ডাকিলেন না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ভবশঙ্কর নিজের গৃহে আসিয়া পবিত্রকে ডাকিবার জন্ত ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন পবিত্র ঘুমাইয়া, উমা তাহার মাথা উপাধানে রাখা করিয়া অন্ন অন্ন বাতাস করিতেছিলেন। ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন “বল গিয়ে পবিত্রের বড্ড অর এসেছে, সে এখন যেতে পারবে না। কাল সকালে অর ছাড়লে তার পরে যা হয় তাই বলবেন।”

পবিত্রের বড় অর, ভবশঙ্কর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নিজকে সংযত করিয়া রাখিবার প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সে চঞ্চলতা গোপন করিতে পারিলেন না, আহারের পর নির্দিষ্ট বিশ্রাম স্থলের আশা ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তেতালার ঘরের রুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন “পবিত্র—”

ভোজানো দরজা খুলিয়া উমা বাহির হইয়া আসিলেন, চুপি চুপি বলিলেন “ডাকবেন না দাদামণি, ঘুমিয়ে পড়েছে, বড় যন্ত্রণার পরে একটু ঘুম এসেছে, এতে অরটা ছাড়লেও ছাড়তে পারে।”

ব্যাকুল কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন “বড় অর এসেছে ?”

শুদ্ধকণ্ঠে উমা বলিলেন “উঃ, সে আর বলবার ল্পা নয়।”

ব্যগ্রভাবে ভবশঙ্কর বলিলেন “তবে মাথাটা ধুইয়ে দাও উমা, আমি শ্রীনাথ ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই, এসে একবার দেখে শুনে যাক।”

উমা বলিলেন “আজই ডাক্তার ডাকবার কোন দরকার নেই দাদামণি, ভগবান করুন যেন দরকারও না হয়। মাথা আমি বেশ করে ধুইয়ে দিয়েছি, তাই ঘুমুতে পেয়েছে।

আপনাকে তার জন্তে কিছু ভাবতে হবে না, আমি তার কাছে আছি। এতকাল তাকে এমনি করেই তো বৃকে করে মানুষ করেছি দাদামণি—”

তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ভবশঙ্কর ফিরিলেন বটে, কিন্তু শাস্তি কিছুতেই পাইলেন না। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই তিনি পবিত্রের খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহার জ্বর সামান্য আধ ডিগ্রি কম পড়িয়াছে মাত্র, এখনও একশ চার ডিগ্রি জ্বর রহিয়াছে।

মাথায় হাত দিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

পবিত্রের জ্বর ছাড়িল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ভবশঙ্কর আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন “উমা—”

ক্লক্ককণ্ঠে উমা বলিলেন “দাদামণি, দেখছেন কি ? আপনারই নির্বুদ্ধিতার দোষে ছেলে হারাতে বসেছেন। আপনার সমাজ বড় না আপনার ছেলে বড়, এইবার বলুন দাদামণি, এইবার একবার পবিত্রের মুখখানার পানে চেয়ে বলুন, আপনার ছেলের চেয়ে আপনার সমাজ বড়, তাই সমাজকে ত্যাগ কিছুতেই করতে পারবেন না, আর সেই সমাজের পায়ের তলায় তাই হাসতে হাসতে ছেলেকে বলি দিচ্ছেন। দাদামণি—”

বলিতে বলিতে উমা ক্ষুদ্রা বালিকার গায় উচ্ছ্বসিতা  
হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভবশঙ্কর মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার  
চক্ষু হইতে অজ্ঞানে কখন দুই ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরে আসিয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন  
“বনমালী, সেখানে টেলিগ্রাম করে দাও বিয়ে হবে না,  
পবিত্রের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আর কলকাতায় গিয়ে  
আজই ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসা চাই। অর্থের দিকে  
চেষ্টা না, যা লাগবে তাই দিয়ে দুজন বড় ডাক্তার নিয়ে  
এসো।”

তিনি পবিত্রের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, অমুশোচনায়  
হৃদয় তাঁহার তখন পুড়িয়া যাইতেছিল।

দিন যার না যার না করিয়াও দিন তো চলিয়া যাইতেছে। যত দিন যাইতেছে, পূরবী দাদামশায়ের অবস্থা দৃষ্টে ততই ব্যাকুলা হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম প্রথম সে বুঝিতে পারিত না, দাদামহাশয় কেন তাহার স্মৃথে ঔষধ খাইতে চান না, আড়ালে খাইতে চান; কিন্তু হুচার দিন না যাইতেই সে মূল সত্যকে অবিকার করিয়া ফেলিল। দাদামহাশয় এক দিন চুপি চুপি জানালাপথে ঔষধ ফেলিয়া দিতেছিলেন, হঠাৎ সেই সময়ে পূরবী গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহা দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ অপ্রস্তুত হইয়া হাতখানা টানিয়া লইলেন।

“কি করছিলে দাদামশাই?”

দাদামহাশয় বিছানায় শুইয়া পড়িয়া হাঁকাঠেছিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না।

অভিमानে হুঃখে ফোতে পূরবী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া বলিল “তোমাদের সবারই ইচ্ছে যাতে আমি পথে দাঁড়াই, তাই না? কেউ মুখে স্পষ্ট দূর দূর বলে ডাড়িয়ে

দিলে, তুমি স্পষ্ট-সেটা বলতে পারছ না, ভাবে প্রকাশ করছো।”

দাদামহাশয় তাহার হাতখানা ধরিয়া কাছে বসাইলেন —“আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি দিদি, মিথ্যে এ টাকা পয়সা বায় করা হচ্ছে না কি? যে পাখী উড়ে যাবার জন্তে ব্যস্ত, তোর এ ভান্সা খাঁচায় কয়দিন সে আটকে থাকবে, তাই একবার বল দেখি ভাই? যাবার বেলায় এখন কোথায় যাতে শাস্তিতে যেতে পারব তাই করবি, তা নয় যত ওষুধ বিস্ত্র এনে গেলাচ্ছিস। না দিদি, আর ওই তেত, টক ওষুধগুলো আমার গেলাসনে, আমি আর খেতে পারব না।”

পূরবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, তাহারই অদৃষ্টের কথা। তাহারই বা অদৃষ্টে না আসিয়াছিল কি? সবার কেমন মা থাকে, তাহারও তেমনি মা ছিল, ভগবান মা দিয়া কাড়িয়া লইলেন, এমন করিলেন যে, মা নামুটার উপর তাহার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার পর স্নেহময় দাদামশাই, তিল তিল করিয়া দিন দিন বুকের রক্ত তাহার বুকে ঢালিয়া যিনি তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার অসীম স্নেহ পাইয়া সে পিতার আদর মায়ের

স্নেহের অভাব কখনও অনুভব করিতে পারে নাই ; তাহার পরে দেবতুল্য স্বামী, রাজার মত স্বশুর, সবই তো সে পাইয়াছিল। মেয়েরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সে আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হইয়াছিল, কোন পাপে তাহার সে সব গেল ? অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন দাদামহাশয়ও মহা-প্রস্থানের পথে পা বাড়াইলেন। কি পাপে—ওগো দয়াল ঠাকুর, একবার ডাকিয়া বলিয়া দাও, কি পাপে পূরবী সব পাইয়াও হারাইতে বসিয়াছে ? তাহার বড় ব্যথার সাক্ষ্য দিতে একটু কিছু রাখিলে না প্রভু ? এমন অদৃষ্ট দিয়াও তাহাকে পাঠাইয়া ছিলে গো ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পূরবী ডাকিল “দাদামশাই—”

“বড় শীত করছে ভাই, গায়ে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেও।”

কিয় দিন অল্প অল্প জরই চলিতেছিল, আজ প্রবল জর আসিয়া পড়িল। পূরবী রাঁধাবাড়া ফেলিয়া রাখিয়া ‘দাদামহাশয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

বৈকালের দিকে যখন জর কম পড়িয়া আসিল, বৃদ্ধ তখন চোখ মেলিলেন।

“তুই আজ খেয়েছিস্ পূরবী ?”

পূরবী মাথা কাত করিয়া বলিল “খেয়েছি দাদা।”

দাদামহাশয় যথাক্রমে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ মুখখানা দেখিয়া লইলেন ; তাহার হাতখানা শিথিল হস্তে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন “এ মিথ্যে কথা কেমন করে বললি ভাই পূরবী ? তোর শুকনো মুখখানাই যে বলে দিচ্ছে তুই আজ কিছু খাসনি। আমার চোখে ধুলো দিতে চাচ্ছিস ভাই, সেটা সহজ হল না তো।”

পূরবী চুপ করিয়া রহিল।

দাদামহাশয় বলিলেন “আজ আমার একটু জ্বর বেগী হয়েছে বলে তুই খেলিনে পর্য্যন্ত, আচ্ছা পাগল মেয়ে তো তুই। যা—ভাত খেয়ে আয় ভাই, খেয়ে এসে বস। বিড়ালটাকে খেতে দিয়েছিস ?”

পূরবী বলিল “তাকে খানিকটে দুধ খাইয়েছি দাদা।”

দাদা বলিলেন “তার পেটটা বুঝলি, নিজেরটা বুঝলি নে ? নাঃ, তুই ভারি বিরক্ত করে তুললি আমাকে। ওঠ, যা পারিস চারটা খেয়ে আয় গিয়ে।”

পূরবী বলিল “আজ ভাত রাঁধিনি দাদা মশাই, থাক গিয়ে, একটা দিন বই তো নয়, খাবার খেয়ে কাটিয়ে দেব এখন।”

উৎকণ্ঠিত দাদামহাশয় বলিলেন “খাবার খেয় কাটি



দিবি ? দূর, তাও কি হয় রে ?” যা—ভাত রন্ধে আমার এই ঘরে এনে খাবি, নইলে কোনমতেই হবে না পূরবী ; আমার দিবা, আমি তোরা হাত ধরছি, অমত করিস নে ।”

তিনি হাত ধরিতেই পূরবীকে উঠিতে হইল ।

আজ পূরবীকে আহাৰ করানো চাই-ই । দেহের মধ্যে বড় যন্ত্রণা । জ্ঞানবান বুদ্ধ বুঝিতে পারিতেছিলেন, প্রাণ পাখী উড়িয়া যাইবার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে । মাগ্নার বাধন সহজে কাটিতে পারিতেছে না, তাই ছটফট করিতেছে । নিজের নাড়ী নিজেই তিনি পরীক্ষা করিতে-ছিলেন, আর নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না । এ কথাটা পূরবীকে তিনি এখনই বলিতে সাহস করেন নাই । এ বার্তা এখনই সে পাইবে, যাহা আসিতেছে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, আগে আহাৰটা তার হইয়া যাক । ইহার পরে তাহার যাহা অদৃষ্ট-লিপি তাহা তো ফলিবেই, আজিকার দিনটা নারায়ণ, তাহার আহাৰ পর্য্যন্ত রক্ষা কর ।

মৃত্যু যন্ত্রণা কি, পূরবী তাহা জানে না, কখনও কাহারও মৃত্যুকালে সে উপস্থিত ছিল না । অসহ্য যন্ত্রণা চাপিতে গিয়া দাদামহাশয়ের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল ; ঝুঁকিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়া পূরবী বলিল “অমন করছো

কেন দাদামশাই, বুকটা বড্ড ব্যথা করছে কি ? একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকি দাদামশাই—?”

বিকৃত মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া দাদামহাশয় বলিলেন, “না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, কিছু যত্ননা হচ্ছে না। তোর ভাত হয়েছে পুরবী ?”

“এই হল দাদামশাই—”

দাদামহাশয় বলিলেন “একবার দেখে আয় দেখি হল কি না। বেশী করে জ্বল দে, এখনই হয়ে যাবে এখন। কাঠের উনানে চড়িয়েছিস তো ?”

পুরবী বলিল “হ্যাঁ দাদামশাই।”

“তবে যা শিগগির—”

সে সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইবামাত্র দাদামহাশয়ের জুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছু জানে না, সংসার যে এর কাছে এখনও অপরিচিত। মৃত্যুর নাম সে বরাবর শুনিয়াই আসিয়াছে, মৃত্যু যে কি ভাবে আসে, কি ভাবে গ্রহণ করে, এ যে তাহা বিন্দুমাত্র অবগত নয়। নারায়ণ, শেষকালটায় কি এমনই অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে প্রভু ? তাঁহার যাইবার সময় উপস্থিত, বহুদিন হইতেই তো তিনি এই আত্মার প্রত্যাশায় আছেন। এই অভাগিনীর ব্যবস্থা সেই জন্তই

তো আগেই তিনি করিয়া দিলেন, কিন্তু কি করিলে নারায়ণ, তাহার সে আশ্রয় এমন করিয়া কাড়িয়া লইলে কেন ? তাঁহার অস্ত্রে সে দাঁড়াইবার স্থান এই বাড়ীখানি পাইবে, কিন্তু থাইবে কি ? সামান্য যে টাকা তিনি পেনসান পাইতেন, তাঁহার অস্ত্রে তাহা তো বন্ধ হইয়া যাইবে ? হা নারায়ণ, তাহার অদৃষ্টে শেষের জন্ম কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ ?

পূরবী তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া চলিয়া আসিল। সে খাওয়া নামেই মাত্র, দুই গ্রাস কোনও ক্রমে উদরে গেল মাত্র। আজ তাহার মনটা বড় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, চারিদিক যেন হু হু করিতেছে, মনের কোন এক গোপন স্থান হইতে কে যেন আর্ক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছে, সব গেল রে, সব গেল।

এ পাশের বাসা ডাক্তার বাবুর ; দাদামহাশয়ের নিকটে আগে না গিয়া সে ছাদের উপর চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, তিনি বাড়ীতেই আছেন। তাঁহাকে একবার এখনি পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়া সে নামিয়া দাদামহাশয়ের নিকট আসিল।

শেষ পথযাত্রী তখন তাহারই আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন, চোখ দুইটা তাঁহার দরজার উপরে পড়িয়াছিল। পূরবী প্রবেশ করিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন “একটু জল দে ভাই, বড় তেষ্টায়—”

পূরবী তাড়াতাড়ি ঘাসে জল ঢালিয়া তাঁহার মুখে দিতে গেল।

“এ কোন জল দিদি, কলের জল না গঙ্গাজল?”

পূরবী উত্তর দিল “কলের জল দাদামশাই।”

দাদামহাশয় নাথা নাড়িয়া বলিলেন “কলের জল এখন আর দিসনে দিদি, গঙ্গাজল নিয়ে আয়, আমার গঙ্গাজল দে।”

পূরবী গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল।

“আঃ, বড় তৃপ্তি রে, বড় তৃপ্তি পূরবী, আমার কাছে এসে বস ভাই, যাতে তোর মুখখানা দেখতে পাই তাই করা।”

উষ্ণগব্যাকুল কণ্ঠে পূরবী বলিল “তুমি অমন করছ কেন দাদামশাই?”

একটু হাসির রেখা মৃত্যু-মলিন মুখে ফুটিয়া উঠিল, “আর যে দেবী নেই রে ভাই, মরণ যে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, আমার তার বুক তুলে নিয়ে সকল জালা জুড়িয়ে দেবে বলে; আমি তার স্বরূপ আকার এইবার যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি রে ভাই।”

“দাদা—দাদা মশাই, আমি যে ডাক্তার বাবুকে ডেকে এলুম—”

শুক কণ্ঠে শুক নেত্র তাহার, আর যে জল আসিতেছে না। হায় ভগবান, পূর্বেই নয়নের জল বহাইয়া দিয়াছ, আজ এই শুকতা দান করিলে কেন? হৃদয় যে জলিয়া যায়, এক বিন্দু বারি দাও, ওগো এক বিন্দু বারি দাও।

বৃদ্ধ হাঁফাইতেছিলেন। “আর ডাক্তারের দরকার কি দিদি? তুই ছেলেমানুষ, বুঝতে পারিসনি, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি সব। আমার নাড়ী ছেড়ে গেছে, আমার বুকের ভেতর বড় যঃণায় ফেটে যাচ্ছে। আর বেলীকণ নয় রে, যাবার সময় হয়েছে। উঃ, তোকে কোথায় রেখে চললুম রে, কার হাতে তোকে দিয়ে যাচ্ছি। পবিত্র—হায়—পূরবী—”

.. “এসহ যজ্ঞণায় তিনি ছটফট” করিতে লাগিলেন, আর্ন্ত কর্তে পূরবী ডাকিতে লাগিল। “দাদা, দাদু, দাদামশাই।”

ডাক্তার আসিলেন, তখন শেষ মুহূর্ত।

রোগী দেখিয়াই ডাক্তার যাইতে পারিলেন না, প্রতিবাসী বৃদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইল।

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বৃদ্ধের শেষ সময় আগত হইল।  
নিশ্চল পূরবী মাথার কাছে বসিয়া।

শান্ত কণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, “অমন করে বসে থাকলে চলবে না মা, তুমি এই বিছানার এই দিকটা ধর, আমি ও-দিক ধরি, চল ছুঁতনে বাইরে বার করি। তার পর যা করার আমি করব এখন।”

বিকৃত কণ্ঠে পূরবী বলিল “কিছু দরকার নেই বাবা, দাদামশাই তাঁর ঘরের ভেতরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যান। এই শেষকালটায় নাড়ানাড়ি করে, তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহকে আর যন্ত্রণা দিচ্ছে কি লাভ হবে বাবা ?

“পূরবী—একবার হরিনাম—”

কথা বাহির হইতেছিল না, কিন্তু জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ ছিল।

ক্লান্ত কণ্ঠে পূরবী দাদামহাশয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। অনিষ্টে শুনিতে কখন বৃদ্ধের চোখ দুইটা চিরতরে মুদ্রিয়া আসিল; শূন্য দেহখানী সংসারে পড়িয়া রহিল সাক্ষ্যস্বরূপ, প্রাণ অনন্তের পথে উধাও হইয়া গেল।

দুঃখ পাইয়া, বেদনা পাইয়া ভয় পাইয়া যে দাদামহাশয়ের স্নেহময় কোলে পূরবী লুকাইত, সে দাদামহাশয় আর নাই ; জগতে একটা মাত্র লোককে সে আপনার বলিয়া জানিয়াছিল, তাঁহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া সে বাঁড়িয়া উঠিয়াছিল । তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ছিন্নলতার মত পূরবী মাটিতে পড়িয়া রহিল ।

দিন তবু বহিয়াই যাইতেছিল একটা দিনও থাকিয়া রহিল না ।

দিনের পর দিন গিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়া মাস, এমনি করিয়া মাসও বহিয়া যায় যে ।

হা রে পতিতার মেয়ে, সব হারাইয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার আর কেন তোর ? নিদাক্ষণ রোদ্র ন্তাপে শুখাইয়া ওরে ফুল, তবু কেন আজও তুই বর্তমান ? ঝরিয়া মাটিতে পড়, একেবারে শুঁড়াইয়া যা, মাটির সহিত মাটি হইয়া মিলিয়া যা ।

কাজ নাই, কৰ্ম নাই, উদ্দেশ্য কিছুই নাই, তবুও কেন বাঁচিয়া থাকা, কৰ্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনটাকে নিমেষে শেষ করিয়া ফেলা যায় না কি ?

এ যে তাহার 'নিভাকার ভাবনা, এক আধবারের ভাবনা তো নয়, এ যে তার চিরসার্থী। ডাক্তারবাবু, তাঁহার স্ত্রী তাহার এই দুঃসময়ে মেয়ের মতই তাহাকে টানিতেছেন। তাঁহারা অভাগিনীর জীবনের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন, মন্থাত্মিক হুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মেয়েটিকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার পরিচয় ইঁহারা বেশ পাইয়াছিলেন।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ ডাক্তার বাবুর নূরপুর হইতে ডাক আসিয়াছিল, ভদ্রীনার পুত্রের সাংঘাতিক ব্যারাম, আকুই বাওয়া চাই।

পুরবীকে তাঁহার স্ত্রী প্রত্যহ নিজের বাটীতে লইয়া ঘাইতেন, বিশেষ আবশ্যক বাতীত নিজের বাড়ীতে তাহাকে ঘাইতে দিতেন না। সুন্দরী যুবতী সে, পাড়ায় মন্দ প্রকৃতির লোকেরও অভাব ছিল না।

পুরবীকে ডাকিয়া তিনি সংবাদটা দিবা মাত্র পূরবীর সুখখানা সাদা হইয়া গেল, দাড়াইতে অসমর্থ হইয়া সে বসিয়া পড়িল।

গম্ভীর মুখে ডাক্তার বলিলেন “অত ভেঙ্গে পড়ছো, কেন মা, সাহস নিয়ে এসো। আমি যা বলি, তাই শোনো। যাবে আমার সঙ্গে সেখানে?”



আবার সেখানে—সেই সমাজের' নিন্দা, ভবশব্বরের তাড়না, এই কয় বৎসরের মধ্যে সে কথা সে তো একটুও ভুলিতে পারে নাই ।

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “না বাবা !”

ডাক্তার তেমনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন “কেন ধাবে না মা ?”

“আর কি আমার সেখানে যাবার মত মুখ আছে বাবা, আজ কয় বছর আগে যা বটনা হয়ে গেছে, এখনও সে কথা আমার মনে যে অলপ্ত অক্ষরে আঁকা রয়েছে । সেই দূর দূর করে তাড়ানোর পরে আবার কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাব বাবা ?”

পূরবীর কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল ।

ডাক্তার এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন “কিন্তু এও মনে কর মা, পবিত্র তোমার স্বামী, সে রোগশয্যায় । যে লোকটী আমায় খবর দিয়েছে, পাগলের মত আবল-তাবল বকে গেলেও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে অনেক খবর জেনে নিয়েছি । তোমার কাছে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে হঠাৎ ছোট্ট ছেলের মত কঁদে উঠে বললে—মাপ করবেন, মার কাছে আমি এ মুখ আর দেখাতে পারব না । ভগবান যদি দিন দেন, আমিই এসে

তাকে নিয়ে যাব, 'আর যদি পরিব্রের কিছু হয়, তাঁর সেখানকার সম্পদ সত্যিই উঠ যাবে, তাঁর আর সেখানে যেতে হবে না।"

পূর্বী দুই হাতে বাণিত এক চাপিয়া ধরিল।

"বাবা—তাঁরই কথা থাকতে দিন। ভগবান যদি সেই সত্যিকার দিনটাই আমায় ফিরিয়ে দেন, তখন আমি বাব বাবা, আমার যাবার সময় এখনও হয়নি।"

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া দুটাইয়া কানিতে লাগিল।

সত্যিই পরিব্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতোছিল; এখন তাহার পুনর্বিহার অবস্থা। বিকারের কোঁকে সে কেবল পুরণাকে ভ'কতেছিল, কমা চাহিতে-ছিল। শত্রু কাঠের মত ভ'ল্লুর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নিজের কাষাফল দেখিতেছিলেন।

ক'লকাতা হইতে দুইজন ডাক্তার আসিয়া পৌছাইলেন প্রকাশ বোসের সময় তাহাকে দেখিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পরিব্র দুম হইতেছিল।

সংযত কণ্ঠে প্রকাশ বোস বলিলেন "আপনি নিজেই নিজের সন্ধান খুঁজে এনেছেন ভ'ল্লুর বাবু। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না, আমার অপরিচিত ভাববেন

না। আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু পবিত্র আমায় বৈশ চেনে, আমিও তার জন্তে আপনাকে চিনেছি। ধর্মের নাম করে অধর্মকে আশ্রয় করেছেন, তার ফলেই আপনি দুইটা নর-নারী হত্যা করতে বসেছেন। আপনার ছেলেকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন, ভবশঙ্কর বাবু, কার জন্তে করেছেন? সমাজের পানে চেয়ে, সমাজকে অক্ষত রাখতে আপনি যে নিজের সর্বস্ব হারাতে বসেছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভবশঙ্কর বাবু, আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম কি এতই অসহ্য, এতই কুসংস্কারে ঢাকা? এই সনাতন হিন্দুধর্ম তো আগে এত সফীর্ণ ছিল না, আপনাদের মত সমাজপতির হাতে পড়ে এর কতই না উদ্দেশ্য হচ্ছে। সমাজ যাদের পেলে গৌরবান্বিত হতে পারত, তাদের আপনারা সমাজ হতে তাড়িয়ে দিচ্ছেন সামান্য একটা ক্রটি ধরে, অল্প সমাজ তাদের বুকে পেয়ে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এমন করেই আমাদের সমাজ ভাল লোক হারিয়ে মন্দ লোককে বুকে ধরে বসত রাজ্যের কুসংস্কার সমস্ত গায়ে জড়িয়ে মেখে বসে আছে। সমাজকে আপনি রক্ষা করতে গেলেন—পতিতার মেয়ে ঘন সমাজে প্রবেশ লাভ করতে না পারে, কিন্তু সত্যিকার চোখ খুলে একবার দেখুন দেখি—এই

সমাজের বুকেই কত না অশান্তি সঞ্চারিত আছে, অথচ তারা বেশ সম্মানিত ভাবে দিন কাটাচ্ছে। যতক্ষণ না প্রকাশ হয় ততক্ষণ সে চলে যায়, আর প্রায়ই প্রকাশ হয়ও না। আর ধর্মের দিক দিয়ে যদি বলেন, আপনার ধর্ম কি তাকে পুত্রবৎরূপে গ্রহণ করলেই হারিয়ে যাবে? ধর্ম বলতে আপনি কি বোঝেন ভবশঙ্কর বাবু, আমি তাই আজ জিজ্ঞাসা করি? পাপের ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন, এই যে দুটি নর-নারী হত্যা করেছেন নিজের হাতে, এ কি পাপ নয়? বাপ হয়েছেন কি একমাত্র স্নেহের সন্ধানকে সমাজের কল্লিত ধর্মের পায়ে এলি দেবার জন্যে? ছি ছি, এখনও আপনি চুপ করে ভাবছেন, সামনে ছেলে অনন্তের পথে যাত্রা করছে, তাকে শেষ নাম শুनावেন তাই কি? বাপের উপযুক্ত কাজ শুধু এইটেই আপনার বাকি আছে করতে? আমার একমাত্র ছেলে যদি এ কাজ করতো ভবশঙ্কর বাবু, সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার ছেলেকে সর্বাস্বত্বকবণে ক্ষমা করতুম, কারণ সে যথার্থ মানুষের কাজ করেছে, একটি জীবনকে একেবারে বার্থ হয়ে যেতে দেয়নি, জগতের সুখ আহলাদ ভোগ করবার অধিকার দিতে আপনার পাশে তাকে টেনে নিয়েছে। এমন মহৎ কাজ কয়জন করতে পারে ভবশঙ্কর বাবু। এ কাজ

করতে ধর্ম্য হারাব না, ভগবান বিক্রম হবেন না, বরং তিনি আশীর্বাদই করবেন।”

নিশ্চয়ম ভবশঙ্করের হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, রুদ্ধ-  
কণ্ঠে তিনি শুধু বলিলেন “ডাক্তার বাবু—”

প্রকাশ বোস উগ্রকণ্ঠ সংঘত করিয়া বলিলেন “বুঝেছি, আপনার অন্তঃকরণ হয়েছে। এখনও ছেলেকে বাঁচাতে পারবেন ভবশঙ্কর বাবু, আমায় আপনি আদেশ করুন আমি পূর্ববীকে এনে দেব, সে আমার বাড়ীতে আছে। আপনার শুভ-অদৃষ্ট তাই অমন মেয়েকে পুত্রাধিকারে লাভ করতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন, গভীর আঘাত পবিত্রের বুকে, সে না এলে পবিত্রকে বাঁচাতে পারা যাবে না। যদি ছেলেকে বাঁচাতে চান, সত্যরূপে ভগবানকে পেতে চান, পতিতার মেয়ে বলে ঘৃণা না করে তাকে আনুন। সমাজ আপনার হাতে, সমাজ কিছু করতে পারবে না। আর যদিও কিছু বলে—বলতে দিন তাকান। যে সমাজ এত অনুদার সে সমাজে বাস করার চেয়ে তাগ করা ভাল। দেবতা ঘুমিয়ে নেই, তিনি বাদা জাগ্রত, তিনি আপনার কাজের ফলাফল বিচার করবেন। বলুন, আদেশ করুন, আমি পূর্ববীকে কাল সকালের মধ্যে এনে দিই।”

তাহার হাত দু'খানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সম্মল  
চোখে কুদ্ধকণ্ঠে ভবনকর বলিয়া উঠিলেন “তাই করুন  
ডাক্তার বাবু, পূর্ববীকে এনে দিন। আমি যে মুখে মাকে  
আমার তাড়িয়েছি, সেই মুখে ফিবে তাকে ডাকতে  
পারতিনি, পত্রকে বিসর্জন দিতে বসেছি, তবু সন্ধ্যা  
তার সামনে গিয়ে দাঁড়তে পারছি নে। আপনি তাকে  
এনে দিন, আমার পবিত্রকে বাঁচান। পবিত্র ছাড়া আর  
আমার কেউ নেই ডাক্তার বাবু, পবিত্র—”

তাহার কণ্ঠ একেবারেই কুদ্ধ হইয়া গেল।

রাত্রের ট্রেনে ডাক্তার কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কিত বক্ষে কম্পিত পদে আচ্ছ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে  
পুরবী পাঙ্কী হইতে নামিল।

“বউ মা—”

বহুকাল পরে এ কাহান আদরের আল্পান ; পুরনী  
অবশুষ্ঠন তুলিয়া দেখিল সম্মুখে উমা।

“মা—”

উমার পদতলে সে লুটাইয়া পড়িল। উমা তাকে  
টানিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন, বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,  
“এসেছিলি মা, আর। তোর ঘরে তুই ফিরে আস, তোর  
সিঁথার সিঁদুরের জোরে পবিত্র আমার বেঁচে উঠুক মা।”

উচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি কাদিয়া উঠিলেন।

সম্পূর্ণ নিরানন্দ পুরী, একটা উচ্চ কথা পর্য্যন্ত  
কাহানও মুখে নাই, সব চূপচাপ। পুরবীর প্রাণটা  
হাঁপাইয়া উঠিল, “কেমন আছেন মা তিনি?”

“কে, পবিত্র? দেখবি আর মা—দেখবি আর।”

সতের দিন অবিরত বিকারের ঝোঁকে যোগের সঙ্গে  
যুদ্ধ করিয়া কাল সকাল হইতে পবিত্র নীরবে পড়িয়া

আছে। সে যে ঝাটিয়া আছে এটুকু জানা যাইতেছে শুধু তাহার মাথা নাড়াতে।

ভবশঙ্কর পুত্রের মাথার শিরেরে তেমনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া। তাঁহার দত্ত ভীষণ আঘাত পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তবুও সে মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলে নাই, পিতৃদত্ত দণ্ড বুকে ধরিয়া নীরবে সে মৃত্যু বরণ করিতেছে। এ কি পিতার পক্ষে বড় কম পরিভাপের কথা যে, তিনি নিজেই পুত্র হত্যা করিলেন? ডাক্তার বলিয়াছেন বড় মন্দ নয়; একেবারে হত্যা করিলেই তো এর চেয়ে ভাল ছিল, তিনি যে তাহাকে তিলে তিলে দত্ত করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিলেন।

আজ যাইতেছে কাহার—তাঁহার না—সমাজের? বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কাহার?

ভয়কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন “পবিত্র—পবিত্র—”

কে উত্তর দিবে?

পবিত্র, বড় অদরের পবিত্র আমার, একবার চা! বাবা, একবার কথা বলে বা বাবা, তোর চির অপরাধ চির পাতকী বাপকে মার্জনা করে বা, এমন করে বুকের মধ্যে ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন করে বাসনে রে!”

উচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি পুত্রের মাথার হাত বুলাইতে



বুলাইতে পাগলের মত ডাকিতে লাগিলেন “ওরে, যে ভুল করেছি আমি তা সংশোধন করব, তোর বুকে যে ক্ষত উৎপন্ন করেছি আমি, তাতে আমিই শান্তির প্রলেপ দেব। পবিত্র, পবিত্র, আমার জীবনাধিক, একবার চেয়ে দেখ, তোর হতভাগা বাপের কথা শুনে যা। ওরে, তাকে এমন করে আগুনের মধ্যে ফেলে যাস নে। হা নারায়ণ,—”

মুক্তকণ্ঠে বৃদ্ধ কঁাদিতে লাগিলেন “আমি যা পাপ করেছি তার শাস্তি আমার অল্প রকমে দাও, পুত্রকে কেড়ে নিয়ো না, এমন করে আমার শেষ জীবনটা চিতার আগুনে ফেলে তিলে তিলে দহ্য করো না। দামোদর নিজের হাতে তোমায় পূজা করি, নিজের হাতে তোমায় তুলসী দেই, সে কি এই জন্তেই ঠাকুর, আমার একান্ত ভক্তির পুরস্কার কি এই দিচ্ছ তুমি? তবে কি তুমি ষথার্থই কিছু নও, সত্যিই কি তুমি পাথর মাত্র। যদি আমার পবিত্রের কিছু হয়, ওগো ঠাকুর, তোমার যে হাতে আমি দীর্ঘ হতে পূজা করে আসছি, সেই হাতে নিয়ে গিয়ে পু রে ফেলে দিয়ে আসব, যে মুখে তোমার প্রশংসা গান করেছি, সেই মুখে প্রচার করব, কিছু নেই, দেবতা নেই, ভগবান নেই। আমার রক্ষা কর—তুমি যে ষথার্থ আছ সে বিশ্বাস আমার ভেঙে না নারায়ণ।”

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া উমা—ঝন্ ঝন্ করিয়া চোখের জল ক্ষেপিতে লাগিলেন। পূর্ববী শক্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে একফোটাও জল আসিল না।

“নানাদামণি—”

সেকাইয়া ভবশঙ্কর দ্বারের পানে দাঁড়িলেন।

“নানাদামণি আপন রংউ মা এসেছে। পবনী, এসে বউ ম, এই ঘরে এস।”

স্বাস্ত ভবশঙ্করের সম্মুখ অবস্থিত শূন্য ঘরে দাঁড়াইল সে, আজ তাহার অনিন্দিত্যের দুঃখানা ভবশঙ্করের চোখের সম্মুখে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। সে কাঁদে নাই, কাঁদিবার শক্তি এখন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার মনোভাব স্পষ্ট নাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা দেখিয়া ভবশঙ্করের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—আহা, বড় অশাগিনী।

“মা—বউ মা—”

এই প্রথম তাঁহার সম্বোধন, কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল “বউ মা, এখানে বস। আজ তোমার বিবহ পূর্তীকার দিন মা; সাবিত্রী যেমন করে মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন, তোমাকেও তেমনি করে আমার পবিত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে মা। আজ আমার পবিত্রকে যথার্থই আমি তোমার

দান করলুম। এত দিনে প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারি নি মা, এমন কি উমাকেও না, আজ তোমার হাতে তাকে দিলুম। দেখব—তুমি যদি যথার্থ সত্যী হও, আমার পণ্ডিতকে তুমিই কেবল ফিরাতে পারবে। আজ এই ঘাঘগা তোমার চেড়ে দিয়ে আমি চললুম, কাল সকালে আমি যেন খবর পাই পণ্ডিতকে তুমি ফিরিয়েছ। এস মা—বস এখানে।”

জ্ঞানশূণ্য বৃদ্ধ পূর্ববীর হাতখানা ধরিয়া পবিত্রের পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া শ্রুত পদে বাহির হইয়া পাড়িলেন।

সারা দিন রাত ঠাকুর ঘরে তাঁহার কাটিয়া গেল, অজস্র চোখের ভলে ভাসিয়া কলকণ্ঠে কেবল ডাকিতে-ছিলেন “ঠাকুর—বিশ্বাস হারাতে দিযো না, বিশ্বাস রাখ আমার, আমার নরশিচ আকারে পরিবর্তিত কর না নারায়ণ, আমি যা আমার তাই কর।”

ডাক্তারেরা আজ এখানেই ছিলেন, কারণ আজিকার রাত্রিটাই অত্যন্ত সঙ্কটের। যদি আজিকার রাত্রিটা কোনও বকমে কাটাইয়া দেওয়া যায়, জানা যাইবে পবিত্র বাঁচিল।

সে সমস্ত রাত্রি উন্মত্ত হইয়া অনিদ্রায় বৃদ্ধ কাটাইয়া দিলেন—ওই বৃদ্ধি কান্না শোনা যায় ওই না উমা চীৎকার করিয়া উঠিল—পবিত্র—পবিত্র—

সকালের আগে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কে সানন্দে চীৎকার করিয়া ডাকিল—“ভবশঙ্কর বাবু! তিনি কোথায়?”

কে উত্তর দিল “ঠাকুর ঘরে।”

ডাক্তার বোস রুহ-দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন “শিগগির দরজা খুলুন ভবশঙ্কর বাবু, দেহী করবেন না।”

কি-প্রহন্তে দরজা খুলিতে খুলিতে বাত্রে পিনা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি খবর ডাক্তার বাবু?”

“খবর ভাল, পবিত্র এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে, আর কোনও ভয় নেই—” সানন্দে ডাক্তার বোস ভবশঙ্করকে আলিঙ্গন করলেন।

ভবশঙ্করের দুই চোখ রিখা আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল—  
“সত্য কথা বলেছেন ডাক্তার বাবু?”

ডাক্তার বোস বলিলেন “বাপের কাছ আমি ছেলের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবার সাহস করি নে ভবশঙ্কর বাবু।”

“নারায়ণ—” ফিরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া রুহ কণ্ঠে ভবশঙ্কর বলিলেন, “তুমি তবে সত্যই আজ দেবতা বড় পরীক্ষায় কলেছিলে, কর্তব্য হারিয়ে ফেলেছিলি, সন্দেহ মন ছিলছিল। চিরান্ত্রিত এ দাসকে এ পরীক্ষা করার কি দরকার ছিল ভগবান? বুঝেছি প্রভু, মিথ্যা

ধর্মের অঙ্কুর করতুম, সমাজের স্বপ্নাঙ্কি করতুম, আমার ধুলোর চেয়েও যেন ত হতে হবে, আত্মমর্ঘাদাধ ক্ষীত হয়ে তা ভুল গিয়েছিলুম, আঘাত দিয়ে আমার সাবধান করে 'দেনে।'

অন্তর চঞ্চল পদে তিনি পবিত্রের গৃহে চললেন, সম্মুখেই ত স্তম্ভী উমা।

বাগবর্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পবিত্র ভাল হয়েছে উমা, জানি হয়ে ছ তার, কথা বলেছে?”

উমা বলিলেন, “হ্যা, সে এখন বেশ কথা বলছে।”

“বউ মা কোথায় উমা?”

উমা বলিলেন “বউ মা তার কাছে বসে আছে।”

“বউ মা -- বউ মা—”

ভদ্রকর গৃহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র পূর্ববী সরিয়া গিয়া এক-পাশে দাড়াইল।

পবিত্রের শাস্ত হাসিমুখা মুণের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ ভবশঙ্কর হৃদয়ে অসীম বল পাইলেন,—পূর্ববীঃ দুঃখানা হাত দুটি ধাতের মধ্যে লইয়া কঙ্ককাণ্ড বলিলেন “মা কল্লী, দুটিই তুই সতী, তাই সাবিত্রীর মত মরা স্বামীকে ফিরিয়া আনতে পেরেছিস্, পবিত্রকে আবার দেখতে দিওছিস্। মা, পাঁচ বছর আগে কি করেছি, কি বলেছি,

সে সব ভুলে যা, আজ আমার গৃহকে তুই পূর্ণ করে রাখ মা, তোর হাসিতে আমার গৃহ ভরে উঠুক। পবিত্রকে আমি তোকে দান করছি, ওর ওপরে অ'দকার এখন একা তোর, আলীদান করছি মা, তুই 'তরায়ুত্ম' নী হয়ে থাক।"

সজল নেত্রে পূবনী তাঁহার পায়েন বুঝা লইল। আজ এই বিপুল আনন্দের মাঝখানে তাঁহার সারাবক্ষণনা জুড়িয়া একটা বাধা জাগিয়া উঠিল--দাদামহাশয়, দাও, আজ এই মিলনের দিনে কোথায় তুমি?"

বৃদ্ধ এ মিলন দেখিতে পাঠিলেন না, এ বড় ফোঁড়ের কথা। তাঁহার পূবনী যখন আবার সব কিরিয়া পাঠিল তখন তিনি পরলোকে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার পরলোকগত আত্মাই এই মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে। পূরবীর জন্ত তিনি জীয়েন্তে সুখী হইতে পারেন নাই, মরিয়াও শান্তি পান নাই। তাঁহার আত্মা এবারে যথার্থই মুক্তিলাভ করিল।

সমাপ্ত

# আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান সংস্করণের মতই—

নাগজ, ছাপা, চাঁদাই—সকল সম্মত।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরা এহঁর প্রথম প্রবন্ধক। বিলাহকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রাপ্তির আশায় ও বাস্তবতে সকল শ্রেষ্ঠের ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মতান উদ্দেশ্যে আমরা এই অশ্লিনব ‘আট-আনা-সংস্করণ’ প্রকাশ করিমাছি।

মতঃখলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম্বারেণ্টে করা হয়। গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ডিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্বে প্রকাশিতগুলি এক সংগ্রহ বা পত্র লিখিয়া, সুবিধামুযায়ী, পৃথক পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকাবভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাগুলের হার বদ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ডিঃ পিঃ ডাকে ৮০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৮০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, “গ্রাহক-নম্বর” সহ পত্র নিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

- ১। অভ্যঙ্গী ( ৭ম সংস্করণ )—রায়ে শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
- ২। ধর্মপাল ( ৩য় সং )—শ্রীরাধালালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
- ৩। পল্লীসমাজ ( ৬ষ্ঠ সং )—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

- ৪। কাঞ্চনমালা ( ২য় সং )—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।
- ৫। 'নবান্ন' বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
- ৬। 'সিঁদুরালী' ( ২য় সং )—শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ ঠাকুর, বি-এ।
- ৭। 'দুর্গাদল' ( ২য় সং )—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
- ৮। 'শাস্ত্রত' 'কিছাবলী' ( ২য় সং )—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
- ৯। 'বাড়বাড়ী' ( ৭ম সংস্করণ )—রায় শ্রীকলধর সেন বাহাদুর।
- ১০। 'সাবিত্রীকীর্তি' ( ৬ষ্ঠ সং )—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ১১। 'মহুড়া' ( ২য় সং )—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ।
- ১২। 'দত্ত ও মিথ্যা' ( ৩য় সং )—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
- ১৩। 'কুৎসিত বাল্যকী' ( ২য় সং )—শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
- ১৪। 'সোঁশার পাড়া' ( ২য় সং )—শ্রীসরোজরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৫। 'কল্যাণী' ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীমতী হেমমলিনী দেবী।
- ১৬। 'স্বাভেলহা' ( ২য় সংস্করণ )—শ্রীমতী নিকুপমা দেবী।
- ১৭। 'বেগম সমাদর' ( সচিত্র )—শ্রীকেশবচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৮। 'নকল পাণ্ডুলী' ( ৪র্থ সংস্করণ )—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ১৯। 'বিস্মদল'—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
- ২০। 'জালদার বাড়ী' ( ২য় সং )—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গাধিকারী।
- ২১। 'মধুপাক' ( ২য় সং )—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
- ২২। 'লীলার সঙ্গ'—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
- ২৩। 'অশ্রুত ঘর' ( ২য় সং )—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
- ২৪। 'মধুমল্লী'—শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী।
- ২৫। 'রসির ডায়েরী'—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
- ২৬। 'সুলের তোড়া'—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
- ২৭। 'ফরানী বিপ্লবের ইতিহাস'—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
- ২৮। 'সীমন্তিনী'—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বহু।



- ২২। নবাব-বিদ্রোহ—অধ্যাপক শ্রীচরণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ।
- ৩০। নববর্ষের স্মৃতি—শ্রী শ্রী সরলা দেবী
- ৩১। নীল মানিক্য (২য় সং) —বায়ু বাহাদুর ক্রীড়ানেশক সেন, ডি-লিট
- ৩২। হিন্দাবিন্যাস—শ্রীকেশবকৃষ্ণ গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
- ৩৩। মাদোবা প্রাসাদ (২য় সং) —শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
- ৩৪। ইংরেজী ভাষান্যায়—শ্রী অক্ষতথ্য চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
- ৩৫। জলছবি—শ্রী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩৬। শততাম্রের চরণ—শ্রী হরিশ্চন্দ্র মুনোপাধ্যায়
- ৩৭। ভ্রামণ-পরিব্রাজ্য (২য় সংস্করণ) —শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
- ৩৮। পথে-বিপথে—শ্রী অরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-অক্সিট
- ৩৯। হরিশ চ্যাপ্তাবলী (৩য় সংস্করণ) —বায়ু চন্দ্রধর সেন বাহাদুর
- ৪০। কোন্ পথে—শ্রী কাজী প্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
- ৪১। পরিণাম—শ্রী উৎকল সর্গদার, এম-এ।
- ৪২। পঞ্চীরাণী—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
- ৪৩। ভবানী—শ্রী নিতাক্ষ বসু।
- ৪৪। অমিয়া ও অস—শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ৪৫। অপরিচিতা (২য় সং) —শ্রী পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
- ৪৬। প্রত্যাবর্তন—শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বহুমতী সম্পাদক।
- ৪৭। দ্বিতীয় চন্দ্র—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।
- ৪৮। ছবি (২য় সং) —শ্রী লরেন্স চট্টোপাধ্যায়।
- ৪৯। মনোরমা (২য় সং) —শ্রী মতী সরস্বতী বসু।
- ৫০। অরেশের শিক্ষা (২য় সং) —শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।
- ৫১। নাচওয়ালী—শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।
- ৫২। প্রেমের কথা—শ্রী ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
- ৫৩। গৃহহারা—শ্রী বিজুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।









